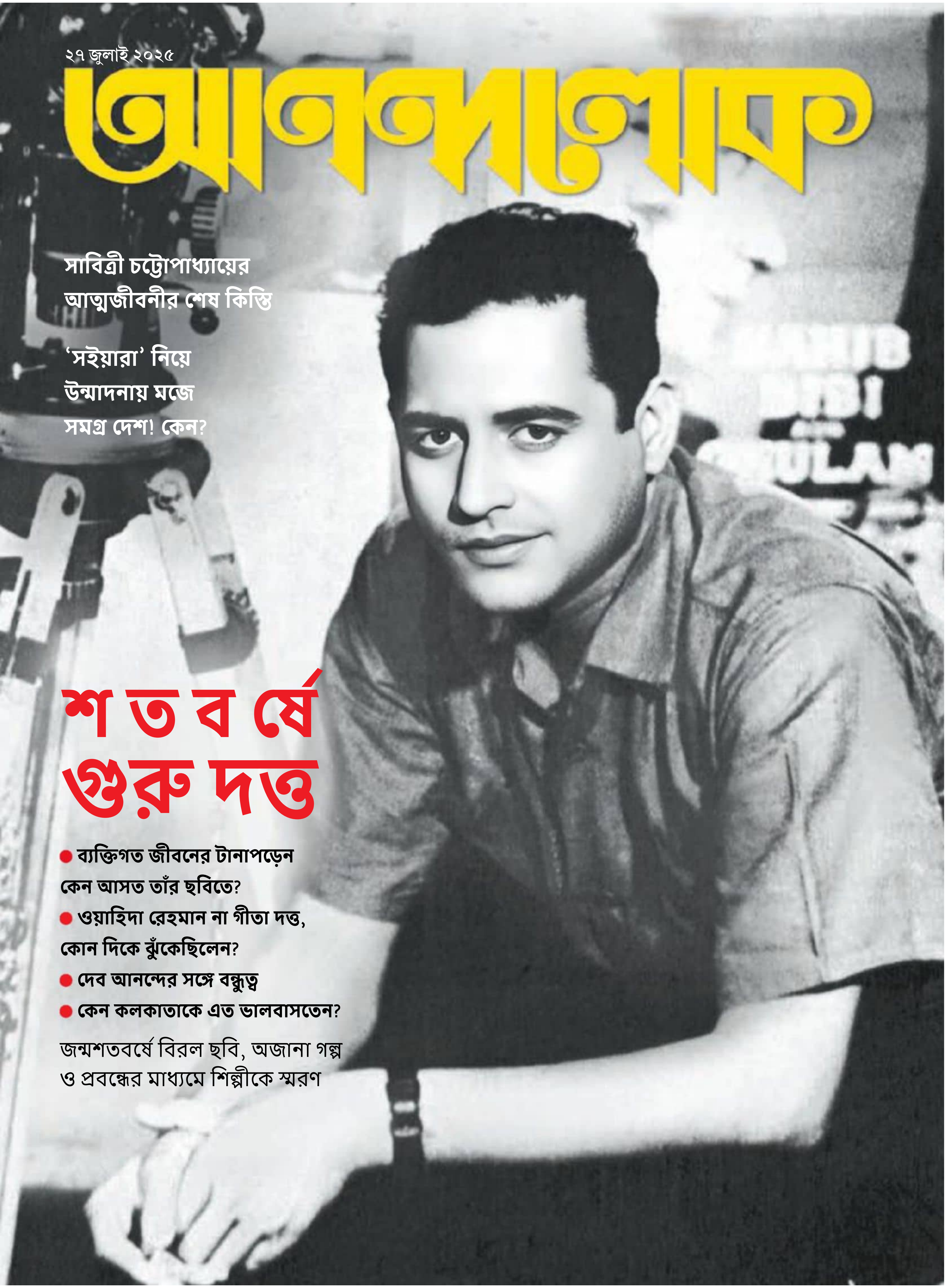
২৭ জুলাই ২০২৫

আনন্দলোক



সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের
আত্মজীবনীর শেষ কিস্তি

‘সইয়ারা’ নিয়ে
উন্মাদনায় মজে
সমগ্র দেশ! কেন?

শ ত ব র্ষে
গুরু দত্ত

- ব্যক্তিগত জীবনের টানাপড়েন কেন আসত তাঁর ছবিতে?
- ওয়াহিদা রেহমান না গীতা দত্ত, কোন দিকে ঝুঁকেছিলেন?
- দেব আনন্দের সঙ্গে বন্ধুত্ব
- কেন কলকাতাকে এত ভালবাসতেন?

জন্মশতবর্ষে বিরল ছবি, অজানা গল্প
ও প্রবন্ধের মাধ্যমে শিল্পীকে স্মরণ


রুটিন-জীবনে নতুন
রুট খোঁজার পুজো!
শারদীয়া ১৪৩২
পত্রিকা
উপন্যাস | ধর্ম | মহাকাব্য | রাজনীতি | গান
সিনেমা | খেলা | ভ্রমণ | খাওয়াদাওয়া | ফ্যাশন
sosideas

আনন্দলোক কোথায় কী
৫১ বর্ষ ১৩ সংখ্যা ২৭ জুলাই ২০২৫

কভার ড্রাইভ



৮

দুঃখবিলাসী ক্যামেরাওয়ালা জিনিয়াস

তাঁকে ‘জিনিয়াস’ বলে সিনেমা জগৎ স্বীকৃতি দিয়েছে তাঁর মৃত্যুর পর। মাত্র ১৩ বছরের কেরিয়ারে গুরু দত্ত তৈরি করেছিলেন এমন একটি দুনিয়া, যা তাঁর অপছন্দের বাস্তব থেকে দূরে। জন্মশতবর্ষে সেই জিনিয়াসের ক্ষুদ্র এবং মহৎ জীবনের বিষাদগাথা

ব্যক্তিগত জীবনের টানাপড়েন কেন আসত তাঁর ছবিতে?

ওয়াহিদা রেহমান না গীতা দত্ত, কোন দিকে ঝুঁকেছিলেন?

দেব আনন্দের সঙ্গে বন্ধুত্ব

কেন কলকাতাকে এত ভালবাসতেন?

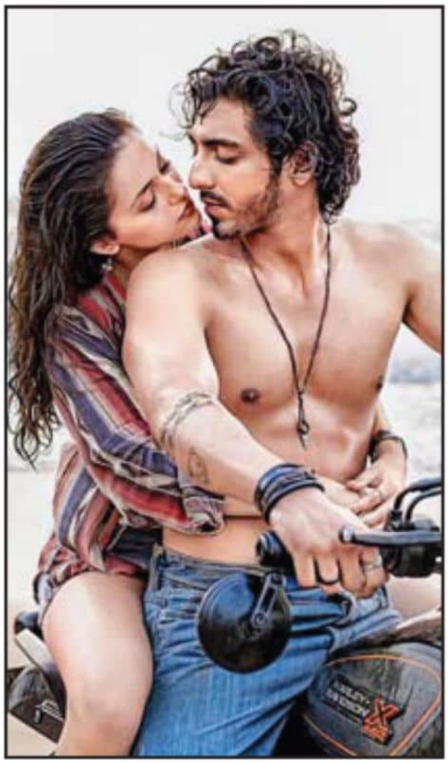
জন্মশতবর্ষে বিরল ছবি, অজানা গল্প ও প্রবন্ধের মাধ্যমে শিল্পীকে স্মরণ

সর্বেন্দ্রর আঘাত



৪৪

আত্মজীবনীতে **সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়** বললেন সর্বেন্দ্রের দেওয়া আঘাতের গল্প



জুম ইন

০৬

হিট মেশিন ‘সইয়ারা’র জনপ্রিয়তার আসল রহস্য

প্রচ্ছদ: গুরু দত্ত

সম্পাদক: কৌশিক পাল

এবিপি প্রা: লিমিটেডের পক্ষে জ়াহরা বসরাই কর্তৃক ৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রা: লিমিটেড, সিপি-৪, সেক্টর V, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০০৯১ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য ৩৫ টাকা

Rs. 35.00/-

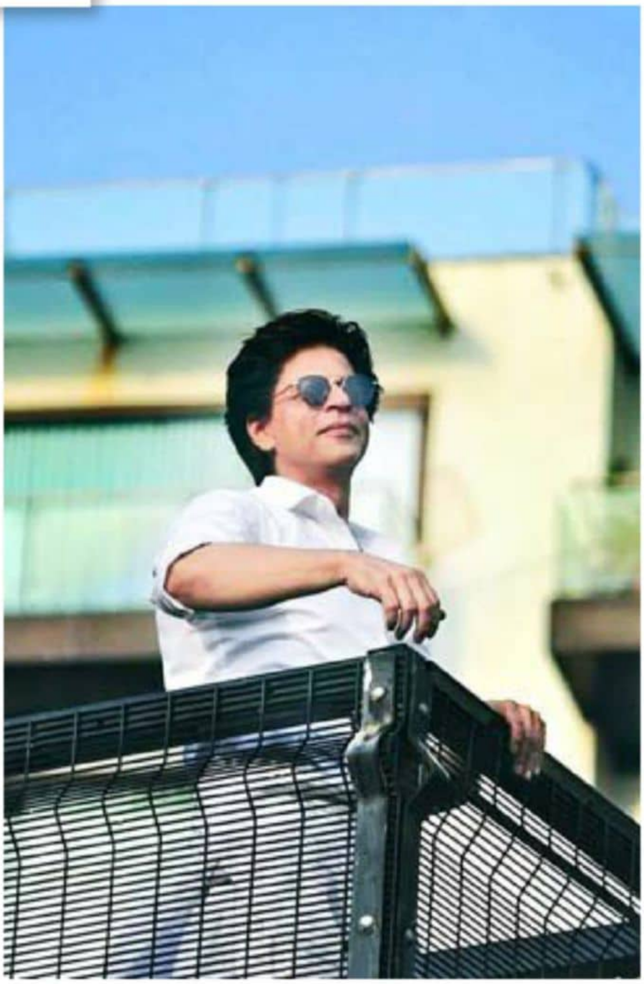
Edited by Kausik Pal and printed and published fortnightly by
Zahra Basrai on behalf of
ABP Pvt. Ltd. 6, Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700001.
Printed at Ananda offset Pvt. Ltd., CP-4, Sector V
Salt Lake City, Kolkata- 700091

Export of this magazine to U.S.A is through our authorised agent only.

Year 51, Issue 13th
RNI Regd No. 27039/74

সেলেবদের আরও হাঁড়ির খবর জানতে চোখ রাখুন **www.anandalok.in**-এ।

ফলো করুন Anandalok anandalok_abp anandalok_abp



■ শাহরুখ খান

অবিশ্বাস্য

শাহরুখের মতো একটা মানুষ বলা বাহুল্য তারকা, বেআইনি কর্মের সঙ্গে যুক্ত? ভাবতে অবাক লাগছে। প্রতিবেদনটি পড়ে অনেক তথ্য পেলাম। ভবিষ্যতে এই বিষয়ে আরও তথ্য পেলে ভাল হয়।

রিক্তা সরকার, দুর্গাপুর

চোখের শান্তি

ওয়ামিকার প্রজাপতি থিমের পোশাক অনবদ্য। পোশাকগুলি অবশ্যই সুন্দর। কিন্তু অভিনেত্রী নিজেকে যেভাবে মেলে ধরেছেন , তা প্রশংসনীয়। অতি সুন্দর এবারের স্টাইলোমিটারের পাতা। এক কথায় চোখের শান্তি।

পূজা দে সরকার, বারাসত

যথোপযুক্ত

দুটো ছবির প্রচার একসঙ্গে করা যায় না, তা জানতাম না। এ বড়ই অদ্ভুত নিয়ম। প্রিয় তারকাকে পুজোর দুটো ছবিতে দেখতে পাব, এটা তো বড় পাওনা। এই নিয়ে দ্বন্দ্ব ব্যাপারটা বড়ই অদ্ভুত।

ইঙ্গিতা সেন, হাওড়া

নতুন বিষয়

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের জীবনের কয়েকটা দিক একেবারেই অন্ধকারাচ্ছন্ন। আত্মজীবনীতে সর্বেন্দ্রকে নিয়ে উনি যা যা উল্লেখ করেছেন, সবটাই আমার মতো অনেকেরই অজানা। উনি যে স্পষ্টবাদী, তা বলতেই হয়।

বৃষ্টি ভৌমিক, রানাঘাট



■ ওয়ামিকা গাব্বি



■ আবীর চট্টোপাধ্যায়

এই পত্রিকায় যাঁরা লিখেছেন বা যাঁদের নিয়ে লেখা বেরিয়েছে, তাঁদের উদ্দেশে জানানো হচ্ছে, পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গে সেই সব লেখা বা সম্পূর্ণ পৃষ্ঠার ছবি কোনও সোশ্যাল মিডিয়ায় তুলে দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।



সকলের 'প্রিয় জয়া'

তারকা হয়েও জয়া আহসান যে তারকা-প্রথা পছন্দ করেন না, তা সাক্ষাৎকারে স্পষ্ট। নিজেকে সাংস্কৃতিক জগতের মানুষ ছাড়া অন্য কিছু না ভাবা, আশাবাদী মনোভাব, ব্যস্ততার মাঝেও মাকে সময় দেওয়া... এই সব কিছুর সমন্বয়েই তিনি হয়ে উঠেছেন আমাদের 'প্রিয়-জয়া'।

নীলেশ নন্দী, মধ্যমগ্রাম



■ সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

নিজের পুরো ঠিকানাসহ অনধিক ১০০ শব্দে চিঠি পাঠান। সেরা পত্র-প্রেরক পাবেন আকর্ষণীয় পুরস্কার। ঠিকানা: আনন্দলোক, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০১
মতামত জানাতে পারেন ই-মেলেও।
anandalok@abp.in


■ 'সইয়ারা' ছবির দৃশ্যে অহন-অনীত

'সইয়ারা' ম্যাজিক

ছবি মুক্তির আগে কোনও প্রচার নেই, নায়ক-নায়িকা দু'জনেই অপরিচিত। ঘটা করে ট্রেলার-মিউজ়িক লঞ্চও হয়নি। কিন্তু রিলিজ়ের চার দিনের মাথায় ১০০ কোটির ক্লাবে! 'সইয়ারা' উন্মাদনার গল্পে **আসিফ সালাম**

সিনেমা হলের ভিতরে ছবি দেখতে-দেখতে কান্নায় লুটিয়ে পড়ছেন তরুণী! এক যুবক দুঃখে নিজের টি-শার্ট ছিঁড়ে খালি গায়ে মাটিতে শুয়ে হাত-পা ছুড়ে কাঁদছেন! আর একটি হলে এক তরুণীকে এই ছবি এতটাই আঘাত করেছে যে, তিনি শ্বাসকষ্টে ভুগতে শুরু করেন। শেষে হলের ভিতর উপস্থিত এক ডাক্তার এসে সিপিআর দিয়ে সেই তরুণীর প্রাণ বাঁচান! এই সবকিছুই হচ্ছে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি 'সইয়ারা' ঘিরে। চার দিনে ১০০ কোটির ক্লাবে ঢুকে গিয়েছে ছবিটি! তাও আবার কোনও প্রতিষ্ঠিত তারকা, দক্ষিণী অ্যাকশন বা আকাশছোঁয়া বাজেটের ভরসায় নয়। নিছক দুই নতুন মুখকে লঞ্চ করে এমন অভূতপূর্ব সাফল্য আসবে, তা ভাবেননি কেউই। ২০২৫-এর সেরা ব্লকবাস্টার মোহিত সুরি পরিচালিত 'সইয়ারা'। যশ রাজ ফিল্মসের ব্যানারে তৈরি এই ছবির ব্যবসা প্রতিদিন যেন নতুন করে তাক লাগাচ্ছে। ছবি মুক্তির আগে না ছিল আহামরি কোনও প্রচার কৌশল, না ছিল নায়ক-নায়িকার কোনও সাক্ষাৎকার। এমনকি, যেখানে বড় তারকাদের ছবিও মাল্টি সিটি টুর ছাড়া প্রচারপর্ব ভাবতে পারে না, সেখানে স্রেফ সমাজ মাধ্যমের প্রচারেই এল চূড়ান্ত সাফল্য। ছবির বিপুল সাফল্যের জেরে অজয় দেবগন অভিনীত 'সন অফ সর্দার ২'-এর মুক্তি পিছিয়ে গিয়েছে। হৃতিক রোশন-জুনিয়র এনটিআর-এর 'ওয়ার ২'এর টিজ়ার লঞ্চের ডেট অবধি পিছিয়ে গিয়েছিল। একই জঁরের ছবি কার্তিক আরিয়ান-শ্রীলীলা অভিনীত 'আশিকী ৩'র মুক্তির তারিখ নিয়েও সংশয় সৃষ্টি হয়েছে। তা হলে 'সইয়ারা'র সাফল্য কি নতুন করে ভাবতে বাধ্য করবে প্রযোজক-পরিচালকদের? অন গ্রাউন্ড প্রোমোশনের জমানা কি সত্যিই শেষ? ছবির গল্প ভাল হলে তারকা-দ্যুতি না হলেও, ছবি সুপারহিট হওয়া সম্ভব? ঠিক কোন ফর্মুলায় সফল হল 'সইয়ারা', তা বোঝার আগে চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক এর তুঙ্গ ব্যবসায়িক অঙ্কের দিকে। ছবি মুক্তির আগেই ট্রেড বিশেষজ্ঞরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, অন্তত ২০ কোটি টাকার ওপেনিং পেতে চলেছে ছবিটি। নবাগত দুই মুখ, অহন পাণ্ডে ও অনীত পাড্ডাকে নিয়ে এরকম লো প্রোফাইল ছবি এত ব্যবসা করবে, ভেবে চমকে ওঠেন অনেকেই। কেউ কেউ তুলনা টানতে থাকেন, ২০০০ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'কহো না পেয়ার



■ পরিচালক মোহিত সুরির সঙ্গে অহন

হ্যায়'তে হৃতিক রোশন-অমিশা পটেলের ডেবিউয়ের। তারপর নাকি বলিউডে অমন আইকনিক ডেবিউ আর হয়নি! 'কহো না...'র সঙ্গে তুলনা কতটা যুক্তিযুক্ত, তা না হয় তর্কসাপেক্ষ। কিন্তু হাল আমলে ব্যবসায়িক ব্যর্থতায় ধুঁকতে থাকা বলিউডকে অক্সিজেন জোগালেন এই দুই নবাগত, জোগালেন পরিচালক মোহিত সুরি। অহন-অনীতই বলিউডের প্রথম নবাগত জুটি, যাঁদের প্রথম ছবি চার দিনে ১০০ কোটি পেরোলো (যদিও অনীত এর আগে 'সালাম ভেঙ্কি'-তে একটি ছোট চরিত্রে কাজ করেছেন)। ছবির বাজেট ৩৫-৪০ কোটি টাকা। রিলিজ়ের শুক্রবার থেকে প্রথম সোমবার অবধি ছবিটি ব্যবসা করেছে ১০৮.৭৫ কোটি (যশ রাজ ফিল্মসের তরফে পাঠানো অঙ্ক)। শুক্র থেকে রবিবারের গ্লোবাল গ্রস বক্স অফিস প্রায় ১১৯ কোটি টাকা! একাধিক রেকর্ড ভেঙেছে ছবিটি। দুই নবাগতকে নিয়ে তৈরি হওয়া ছবির মধ্যে এটিই সর্বোচ্চ ওয়র্ল্ড ওয়াইড ওপেনিং পেয়েছে। ওপেনিং উইকেন্ডে সর্বোচ্চ ব্যবসাকারী রোম্যান্টিক ছবির তকমাও 'সইয়ারা'-র ঝুলিতে। মোহিত সুরির কেরিয়ারের সেরা ওপেনিং তো বটেই, কোনও নবাগত অভিনেতার ছবি হিসেবে সর্বোচ্চ অগ্রিম বুকিং হয় এই ছবিটির।

অ্যাকশনের বদলে ক্ল্যাসিক রোম্যান্স, এটাই সাফল্যের মন্ত্র?

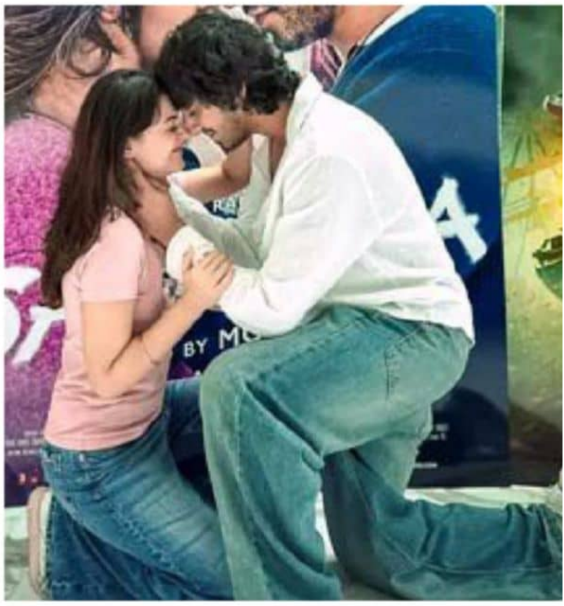
আদ্যোপান্ত অ্যাকশন আর ভায়োলেন্সের যুগে 'সইয়ারা' যেন প্রেমের বাতাস নিয়ে এল থিয়েটারে। নয়ের দশকের ক্ল্যাসিক রোম্যান্সের ঘরানায় ইতি পড়েছে বহুদিন হল। কিন্তু এই ছবির সাফল্যেই স্পষ্ট রোম্যান্টিক ছবির গল্প যদি ভাল হয়, তা হলে মানুষ হলে আসবেই। চেনা অ্যাকশন ছকের বাইরে রোম্যান্সের উপর ভরসা রেখেই কি তা হলে বাজিমাত ছবির? সিনেমা হলগুলোয় উপচে পড়ছে তরুণ প্রজন্মের ভিড়। হলে এত ভিড় হচ্ছে যে, খোদ কলকাতাতেই রাতের শো বাড়ানো হয়েছে। রাত ১১.৪৫ ও ১১.৫৫-তেও হাউজ়ফুল! এমন উন্মাদনা এরকম মধ্য বাজেটের ছবিতে কবে দেখা গিয়েছে? বড় বাজেটের বড় ক্যানভাসের ছবি নাকি বলিউড আর বানাতে পারে না! সে জায়গা দখল করেছে দক্ষিণ। বলিউড মানেই যেন মধ্য বাজেটের ছোট শহরের গল্প বলা। না হলে তা বায়োপিক বা দেশপ্রেমের ছবি। সাম্প্রতিক 'স্ত্রী', 'মুনঝ্যা' বা 'ছাওয়া' এই ফর্মুলাতেই সফল। সেই পথে না হেঁটে ক্লাসিক বলিউড রোম্যান্সকেই ফিরিয়ে এনেছে 'সইয়ারা'। ঠিক যে ফর্মুলায় এর আগে 'আশিকি ২' সফল হয়েছিল। উল্লেখ্য, বিশেষ ফিল্মসের ফ্র্যাঞ্চাইজ়ি থেকে বাদ পড়েছিলেন মোহিত। তার জায়গায় 'আশিকি ৩'-এর পরিচালক হিসেবে নেওয়া হয় অনুরাগ বসুকে। নিন্দুকেরা বলছেন, মোহিত তাঁদের যোগ্য জবাব দিলেন!

টিকিটের দাম বেঁধে দেওয়া

যশ রাজ ফিল্মসের তরফ থেকে এগজ়িবিটরদের অনুরোধ করা হয়েছে, টিকিটের দাম যেন না বাড়ানো হয়। ছবির বড় অংশের দর্শক তরুণ প্রজন্ম। তাঁদের কথা মাথায় রেখে নিয়ন্ত্রিত টিকিট রেট রাখা হয়েছে। এটিও সাফল্যের অন্যতম কারণ তো বটেই। টিকিটের দাম বেঁধে দেওয়া নিয়ে এর আগে বহুবার চর্চা হয়েছে। দক্ষিণে একাধিক রাজ্যে সরকার নিয়ম করে টিকিটের দাম বেঁধে দেয়। বলিউডের ছবিতে সেখানে দাম আকাশছোঁয়া। তা হলে সাধারণ দর্শক আসবেন কী করে? সেই দিক থেকেও ছক ভেঙেছে 'সাইয়ারা'।

নতুন জুটিকে 'এক্সক্লুসিভ' রাখা

এ বার আসি প্রচার কৌশলের চমকে। দুই নবাগতকে একপ্রকার সরাসরি পর্দায় লঞ্চ করেছে যশ রাজ ফিল্মস। মুক্তির আগে কোনও মাল্টি সিটি টুর নয়, কোনও মিডিয়া সাক্ষাৎকার নয়, ঘটা করে ট্রেলার বা টিজ়ার লঞ্চ নয়... অহন পাণ্ডে ও অনীত পাড্ডাকে কার্যত 'এক্সক্লুসিভ' রাখতে চেয়েছিলেন নির্মাতারা। বদলে, ছবির প্রচারের নতুন কৌশল এখন সমাজ মাধ্যম। সমাজ মাধ্যমের

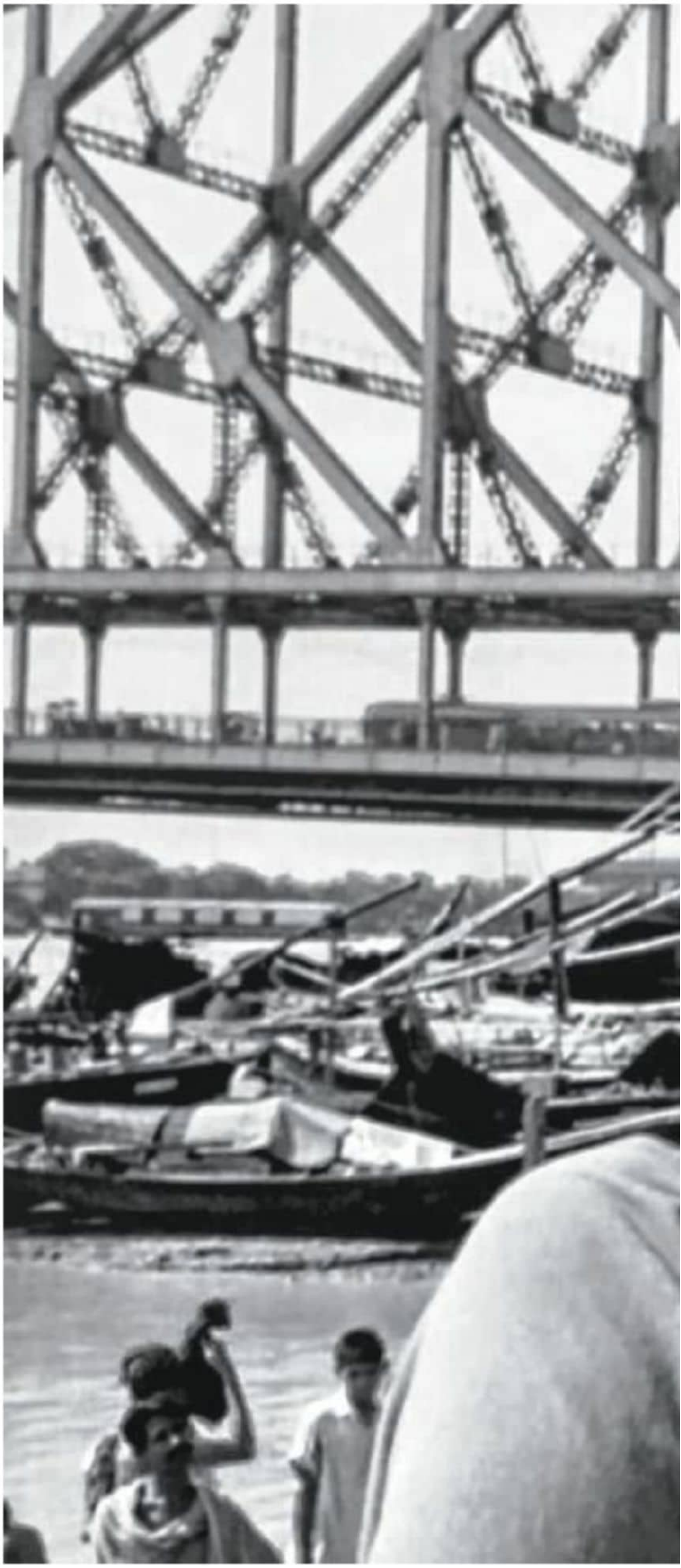


■ নিজেদের ছবির পোস্টারের সামনে অহন-অনীত

টুকরো রিলস-এ অহন-অনীতের জমাটি রসায়নের ঝলক দেখেই মজেছেন দর্শক। তা সে যতই নিন্দুকেরা অহনকে নেপো কিড (চাঙ্কি পাণ্ডের ভাইপো) বলে সম্বোধন করুন না কেন। যতই বলুন এ ছবিকে দর্শক নাকি 'আশিকি'র স্পিরিচুয়াল সিকোয়েল ভেবে দেখতে আসছেন...ব্যবসায়িক অঙ্কই শেষ কথা বলবে।

এই সমস্ত ফ্যাক্টরের পাশাপাশি ছবির সাফল্যের পিছনে অবশ্যই রয়েছে একটি মনোরম গল্প এবং তার সঙ্গে অহন-অনীতের পরিশ্রম। সঙ্গে অবশ্যই যোগ হবে ছবির মিউজ়িক। সব মিলিয়ে গোটা দেশের এখন একটাই অ্যান্থেম...'সইয়ারা তু তো বদলা নেহি হ্যায়, মৌসম জ়রা সা রুঠা হুয়া হ্যায়।'

দুঃখবিলাসী ক্যামেরাওয়ালা জিনিয়াস



তাঁকে 'জিনিয়াস' বলে সিনেমা জগৎ স্বীকৃতি দিয়েছে তাঁর মৃত্যুর পর। মাত্র ১৩ বছরের কেরিয়ারে **গুরু দত্ত** তৈরি করেছিলেন এমন একটি দুনিয়া, যা তাঁর অপছন্দের বাস্তব থেকে দূরে। জন্মশতবর্ষে সেই জিনিয়াসের ক্ষুদ্র এবং মহৎ জীবনের বিষাদগাথা লিখছেন **অংশুমিত্রা দত্ত**

দুঃখের সঙ্গে 'বিলাস' শব্দটি যেন আনন্দের উৎস। মানে দুঃখের মধ্যে থেকে সুখ খুঁজে নেওয়াটাই যেন জীবনের উদ্দেশ্য। কিন্তু যদি উল্টোটা হয়? তার ফলাফল জীবনবিমুখতা, অর্থাৎ মৃত্যু।

গুরু দত্ত যেখানে যেতেন, গলায় ঝুলত একটি ক্যামেরা। এটাই যেন একজন ভিশুয়াল আর্টিস্টের পরিচয়। হিন্দি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে একটি কথা প্রচলিত, 'গুরু দত্ত স্টাইলে শুট করুন।' প্রায়ই সিনেমাটোগ্রাফারকে পরিচালকরা এমন আবদার জানিয়ে থাকেন। কাব্যিক গল্পকথন, সামাজিক



গুরু দত্ত। কলকাতা ছিল তাঁর প্রাণের শহর

ধারাবিবরণী তো তাঁর সিনেমার বৈশিষ্ট্য বটেই। তবে 'এস্ট্যাবলিশিং শট' দিয়ে সিন শুরু করা 'গুরু দত্ত স্টাইল'। একটি ওয়াইড শট দিয়ে দৃশ্যের শুরু, স্থান-কাল এবং প্রসঙ্গ বুঝিয়ে দিতেন। তারপর আসত ক্লোজ়আপ শট। প্রথম লং ফোকাল লেংথ লেন্স, ৭৫ মিমি এবং ১০০ মিমি তিনিই ব্যবহার করেন। ৫০ মিমি লেন্সের মতো করে দেখে চোখ, কিন্তু ৭৫ মিমিতে গোলাকৃতি ক্লোজ়আপ ধরাও 'গুরু দত্ত স্টাইল'।

তদবীর সে বিগড়ি হুই তকদীর বনা লে

আসলে সাধারণভাবে গল্প বলার জন্য গুরুর জন্মই হয়নি। ঠিক যেমনটা গুরুর কাছ থেকে প্রত্যাশিত, অন্তিম সময়ে গিয়ে তিনি তাঁর চেয়ে একদম আলাদা কিছু করে বসবেন। 'বাজ়ি', 'আর পার', 'সিআইডি' বানিয়ে দিব্যি সফলভাবে চলছিল গুরুর প্রযোজনা সংস্থা। কিন্তু তিনি বানিয়ে ফেললেন নিজের স্বপ্নের ছবি 'পিয়াসা', যেটা দর্শক এবং

> পরিচালক-প্রযোজক, পরিচালক-সঙ্গীতকার, পরিচালক-চিত্রনাট্যকার আকছার দেখা যায়। কিন্তু পরিচালক-কোরিয়োগ্রাফার?

সমালোচকদের বুঝতেই অনেকটা সময় লেগে গেল।

পরিচালক-প্রযোজক, পরিচালক-সঙ্গীতকার, পরিচালক-চিত্রনাট্যকার আকছার দেখা যায়। কিন্তু পরিচালক-কোরিয়োগ্রাফার? বিশেষত সময়টা যখন পাঁচের দশক। গুরু দত্তর ব্যক্তিত্ব দেখে বোঝা দুষ্কর যে, তিনি নিজে গানের কোরিয়োগ্রাফি করতেন। কারণ তিনি উদয়শঙ্করের কাছে নাচ শিখেছিলেন। ভাবতে পারেন, চারের দশকে ১৭৫০ টাকা মাইনে পেতেন উদয় শঙ্করের নাচের স্কুলে, পেশাদার নৃত্যশিল্পী হিসেবে!

আবার এই সিনেমাপ্রেমী জিনিয়াস একসময় জীবনের ভালবাসা, প্রিয়তমা স্ত্রীর কথা শুনে ছেড়ে দিয়েছিলেন পরিচালনা।

বাসন্তী এবং শিবশঙ্কর পাড়ুকোনের বড় ছেলে বসন্তকুমারের জন্ম ১৯২৫-এর ৯ জুলাই, কর্ণাটকের পাড়ুকোন গ্রামে। পাড়ুকোনরা একটি সারস্বত ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়। এবং দীপিকা পাড়ুকোনও লতায়-পাতায় গুরু



ছেলে তরুণ এবং গুরুর জন্মদিন একই দিনে। সঙ্গী স্ত্রী গীতা দত্ত



ওয়াহিদা, গুরু ও গীতা। প্রেমের অমর এক ত্রিকোণ



■ বার্লিন ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে ওয়াহিদা ও গুরু দত্ত

দত্তদের বাপের বাড়ির সম্পর্কিত। আবার শ্যাম বেনেগলের ঠাকুরমা এবং গুরুর দিদিমা ছিলেন দু'বোন। ফলে শ্যাম বেনেগল গুরুর তুতো-ভাই। এবং এই বেনেগল পরিবারের সঙ্গে গুরুর যোগ অত্যন্ত গভীর। সেই বিষয়ে পরে আসি। কিন্তু এই যে বসন্তকুমার পাড়ুকোন হয়ে গেলেন গুরু দত্ত, তার পিছনেও রয়েছে একটি গল্প। জন্মের পর থেকেই বসন্ত পদে-পদে অসুস্থ হয়ে পড়ত। গুরুর মা ছিলেন যুক্তিবাদী, শিক্ষিকা, লেখিকা। কিন্তু বাবার বিশ্বাস টলে যায়। এক সাধকের কাছে আরোগ্যের জন্য গিয়ে নামটাই পাল্টে ফেলেন ছেলের। বসন্তকুমারের নাম বদলে হল 'গুরু'। পদবী 'দত্ত' হল ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের মিলিত শক্তিবিশিষ্ট দত্তাত্রেয় থেকে।

এমনিতে গুরু এবং তাঁর ভাইবোনদের উপর পিতার প্রভাব তেমন ছিল না বললেই চলে। মা বাসন্তী শিক্ষিত হলেও, প্রথাগত শিক্ষার্জন করেছেন সন্তানধারণের পর। গুরু ছোটবেলায় দেখেছেন, মা দশম শ্রেণির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বাড়ি ফেরার পর বাবা কী তুমুল অশান্তি করেছেন! বাবা কোনওদিন থিতু হননি। একটির পর একটি চাকরি পাল্টেছেন। সেই চাকরির সুবাদেই একটা সময় তাঁরা কলকাতায় এসে পড়েন। সেখানে কাকা বি বি বেনেগলের বাড়িতেই অনেকটা সময় কেটেছে গুরুর। কাকিমা ছিলেন বাঙালি। সারস্বত ব্রাহ্মণ ভাইপোকে তিনি মাছে-ভাতে মানুষ করেছেন। বি বি বেনেগল ছিলেন ছবির পোস্টার আর্টিস্ট। তিনি পেতেন বিভিন্ন ছবির স্ক্রিনিংয়ের পাস। সেই পাস নিয়ে গুরু এবং ভাইবোনরা যেতেন সিনেমা দেখতে। কলকাতার সেই দিনগুলো, বাউল গান, বাংলা ভাষা, বাঙালি খাবার গুরুকে অন্য এক মানুষ করে তুলেছিল। কলকাতায় উদয়শঙ্করের অনুষ্ঠান দেখে গুরু দত্ত অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠেন, কাকা বি বি বেনেগলই ১৯৪৩-এ গুরুকে আলমোড়ায় উদয় শঙ্করের নাচের স্কুলে ভর্তি করে দেন। পরবর্তীকালে এক জীবনীকার সেই স্কুলে গিয়ে প্রোগ্রেস রিপোর্টে দেখেন, 'গুরু দত্ত পাড়ুকোন' সমস্ত বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন, খেলোধুলো ছাড়া। উদয়শঙ্করের 'রামায়ণ' নৃত্যনাট্যে লক্ষণের চরিত্রে অভিনয় করে (রামের চরিত্রে অভিনয় করতেন উদয় শঙ্কর) প্রশংসিত হন গুরু দত্ত। এই নাচের শিক্ষার ছাপ পরবর্তীকালে গুরুর সিনেমায় ধরা পড়ে। যেভাবে তাঁর চরিত্ররা চলাফেরা করে, তার মধ্যেও একটা নৃত্যছন্দ রয়েছে।

গুরু যখন আলমোড়ায়, তাঁর মা-বাবা ও ভাইবোনেরা বম্বে চলে যান, বাবার চাকরিসূত্রে। মাটুঙ্গা অঞ্চলের এক কামরার বাড়ি। পাশেই থাকত সাফাইকর্মীদের এক পরিবার। গুরুর মা ছিলেন গান্ধীবাদী। স্কুলে

শ্যাম বেনেগলের ঠাকুরমা এবং গুরুর দিদিমা ছিলেন দু'বোন। ফলে শ্যাম বেনেগল গুরুর তুতো-ভাই। এবং এই বেনেগল পরিবারের সঙ্গে গুরুর যোগ অত্যন্ত গভীর



■ পাড়ুকোন পরিবারের মা ও বাচ্চারা। বাঁদিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে গুরু

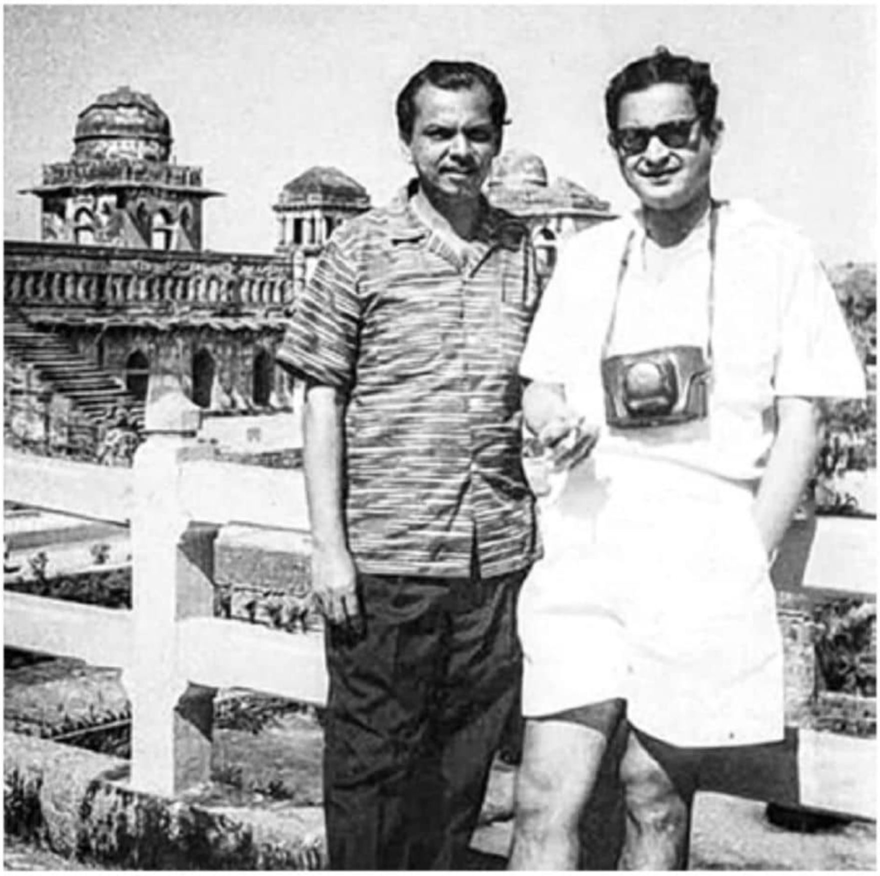
পড়াতে শুরু করেন, সঙ্গে প্রতিবেশীদের বাচ্চাদেরও, বিনা পারিশ্রমিকে। পরবর্তীকালে দেখা যায়, গুরুর মধ্যেও এই সেবা বা মানুষের পাশে দাঁড়ানোর প্রবণতা ছিল। মালা সিনহার বাড়িতে একবার ইনকাম ট্যাক্স রেড হয়। মালার কাছে টাকাপয়সা কিচ্ছু ছিল না। তখন গোটা ইন্ডাস্ট্রি মালার সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করেছিল, গুরু ছাড়া। মালার বাড়িতে পকেটভর্তি টাকা নিয়ে তিনি গিয়েছিলেন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে। চারের দশকে দাঁড়িয়ে গুরু ভাইবোনদের লেখাপড়ার খরচের জন্য বাড়িতে টাকা পাঠাতেন। কারণ তিনি কোরিয়োগ্রাফার হিসেবে ১৭৫০ টাকা মাস মাইনে পেতেন, আর বাবা ব্যাঙ্কে চাকরি করে পেতেন ৭৫০ টাকা। এখানেও গুরুর উন্নতি দেখে মনে হতে পারে, নাচেই তিনি কেরিয়ার গড়বেন। কিন্তু আবারও সেই স্কুল ছেড়ে গুরু বম্বে চলে আসেন। কারণ? সিনেমা বানানোর তাড়নায়।
বি বি বেনেগল গুরুর জীবনে চালিকাশক্তির মতোই। ভাইপো সিনেমাপাগল বুঝে বি বি তাঁকে নিয়ে যান পুণের প্রভাত স্টুডিয়োয়।

হয়তো নিজের অজান্তে বাবার মতো হয়ে গিয়েছিলেন গুরু। তাঁর বাবা তো নিতে পারেননি মায়ের কাজের জগৎ। কোথাও গিয়ে গুরুও কি তেমনভাবেই ভাবতেন? বাবার মতো?

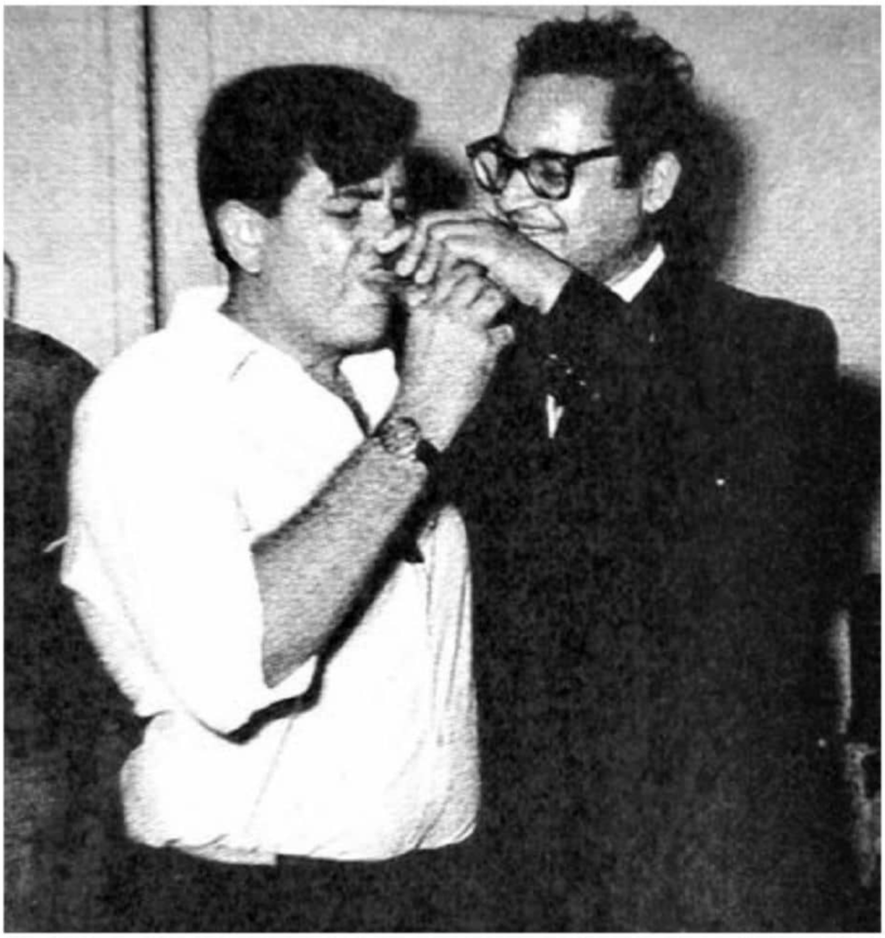
সেখানে কোরিয়োগ্রাফারের কাজ পান গুরু। পরে জ্ঞান মুখোপাধ্যায়ের সহকারী-পরিচালক হিসেবে কাজ করেন। সেখানেই গুরুর প্রথম দেখা দেব আনন্দের সঙ্গে। তৈরি হয় এক অটুট বন্ধুত্ব। সেই বন্ধুত্বের জেরে, দেব আনন্দ যখন ছবি প্রযোজনা করেন, সেই ছবিতে ('বাজ়ি') পরিচালক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন গুরু দত্ত। এবং গুরুও কথা রেখে নায়ক হিসেবে বেছে নেন দেবকে।

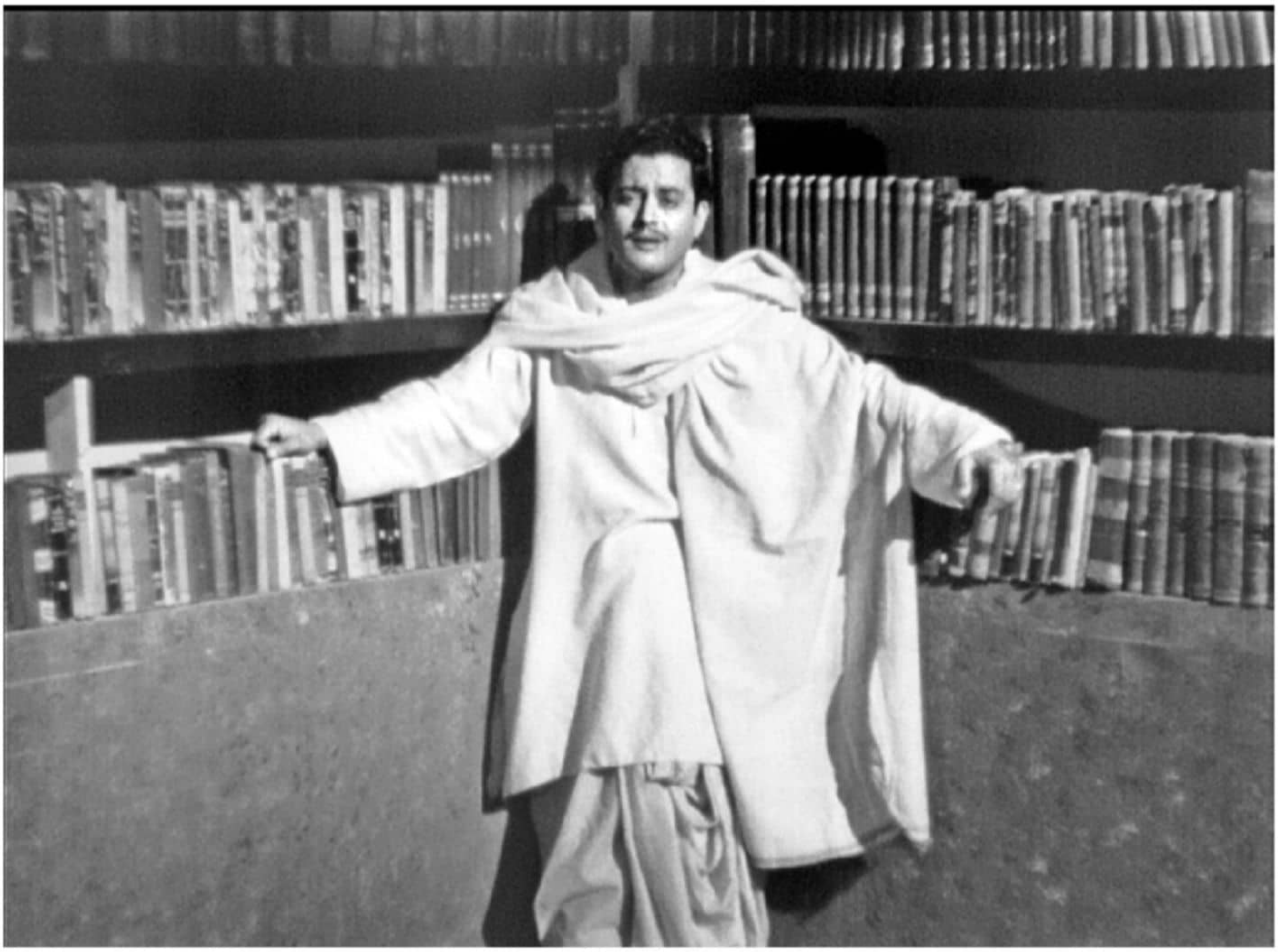
বাবুজী ধীরে চল না পেয়ার মেঁ জ়রা সমহলনা

গুরু যখন আলমোড়া থেকে বম্বে চলে আসেন, তখন তাঁর পরিবার খুব একটা অবাক হয়নি। গুরুর ভাই দেবী দত্তর কথা অনুযায়ী, 'কন্নড় যুবক, যে বাঙালি খাবার খেয়ে বড় হয়েছে, সে কি আর পাহাড়ি খাবার খেয়ে বেশিদিন থাকতে পারে?' আরও একটি 'নিয়তি' হয়তো বম্বেতে নিয়ে এসেছিল



বন্ধু জনি ওয়াকারের সঙ্গে গুরু। গলায় সেই ক্যামেরা। (নীচে) বন্ধু রাজ কপূরের সঙ্গে





■ ট্র্যাজেডি কিং গুরু দত্তর চেনা অবতার? আসলে এই রূপে তিনি দিলীপকুমারকেই আনতে চেয়েছিলেন ক্যামেরার সামনে

গুরুকে। প্রেম। ১৯৪৪ সালে তখন গীতা ঘোষ রায়চৌধুরীও বম্বেতে হিন্দু কলোনিতে থাকতেন, গুরুর পাড়াতেই। গল্লি ক্রিকেট খেলে, আড্ডা মেরে, স্টুডিয়োয় কাজ করে, সাপ্তাহিক পত্রিকায় গল্প লিখে গুরু যখন অলস দিন কাটাচ্ছেন, গীতা তখন টুকটাক গান গাইছেন, কিন্তু বড় ব্রেক কিছু পাননি। দু'জনের প্রেম জমে উঠল, চিঠিচাপাটি চালাচালি, একসঙ্গে মসকা পাও খাওয়া চলল। অনেকেই বলেন, গুরুর সঙ্গে যখন গীতার প্রেম হয়, তখন গীতা তারকা! কথাটি মোটেই সত্যি নয়। গীতার ডিস্কোগ্রাফি বলছে, 'দো ভাই' ছবিতে (১৯৪৬) গান গেয়ে গীতা পরিচিতি পেয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর কেরিয়ারের পথ বাঁক নেয় 'বাজ়ি' ছবির গান দিয়েই। অর্থাৎ তারকা হওয়ার ক্ষেত্রে গুরু ও গীতার জীবনে (এবং দেব আনন্দেরও) 'বাজ়ি' ছবিটিই নির্ধারক। গুরু ও গীতার দাম্পত্য নিয়ে দেবী দত্ত এবং গুরুর বোন ললিতা লাজমি (চিত্রশিল্পী এবং পরিচালক কল্পনা লাজমির মা) অনেক কথাই বলেছেন। যেমন, গুরু এবং গীতা পরস্পরের ব্যাপারে সমস্ত রটনায়

'পিয়াসা'র জন্য তাঁর পছন্দ ছিলেন দিলীপকুমার, সেই সময় তিনি ট্র্যাজেডি কিং! কিন্তু মহরতের দিন দিলীপ এলেনই না। ক্যামেরার সামনে গুরু এলেন মায়ের কথায়

বিশ্বাস করতেন। গুরুর মনে হত, গীতার কণ্ঠ শুধুমাত্র তাঁর ছবিতে ব্যবহৃত হোক। গুরুর জীবনে যেমন বাবা একরকম অদৃশ্যই ছিলেন, তিনি নিজেও একটা সময় গিয়ে কাজে ডুবে পরিবারকে অবহেলা করেছেন। ছোট বয়স থেকে যেমন নিজের বাবাকে দেখেছেন পরিবারের অন্নসংস্থানের সমস্ত দায়িত্ব নিজকাঁধে নিতে (মায়ের রোজগারের টাকা কখনও নিতে চাননি শিবশঙ্কর) তেমনই হয়তো নিজের অজান্তেই বাবার মতো হয়ে গিয়েছিলেন গুরু। তাঁর বাবা তো নিতে পারেননি মায়ের কাজের জগৎ। কোথাও গিয়ে গুরুও কি তেমনভাবেই ভাবতেন? মনে হতে পারে, গুরু হয়তো আর্টকে এত বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন যে, ফিল্মের বাণিজ্য নিয়ে ভাবেনইনি। কিন্তু বাস্তব তা নয়। গুরু যখন সিনেমা বানানো শুরু করেন, তারপর যখন প্রযোজনা সংস্থা বানান, তিনি বুঝতে পারেন, শিল্পবোধকে তুষ্ট করার জন্য ছবি বানিয়ে পেট চলবে না। এবং স্টুডিয়োতে অন্য অনেকগুলো মানুষের পেটের কথাও ভাবতে হয়। মানে, তিনি অন্তত ভাবতেন। ফলে একটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বিশাল শুটিং স্পেস তৈরি করেন, সেই সময় তার চেয়ে একমাত্র বড় স্টুডিয়ো ছিল মেহবুব স্টুডিয়ো। রেকর্ডিং ভ্যান তৈরি করেন 'সাইট অ্যান্ড সাউন্ড' নামে। সেই স্টুডিয়ো ভাড়া নিতেন বাকিরা, রেকর্ডিং ভ্যান ডাবিংয়ের জন্য ভাড়া নিত। তিনি যেহেতু সবসময় সিনেমা বানাতে পারবেন না, স্টুডিয়োর কর্মীদের যেন কাজের অভাব না হয়, সেই ভাবনা থেকেই। সিনেমাপাড়াতেও এই 'বড় ছেলে' বা গৃহকর্তার ভূমিকা পালন করতে গিয়ে কোথাও একটা সন্তানদের জীবনে উপস্থিত থাকতে পারেননি গুরু। গুরুর ছেলেমেয়েরা নানা সাক্ষাৎকারে বলেছেন, গুরু সবসময় একটা বিষাদে ডুবে



■ 'সাহেব বিবি অউর গুলাম'-এর দৃশ্যে মীনাকুমারী ও গুরু দত্ত



■ ট্রেনযাত্রা: গুরু, গীতা ও ওয়াহিদা রেহমান। ওয়াহিদার সঙ্গে গুরুর সম্পর্কের কারণেই কি গীতার ঘর ছাড়া?

থাকতেন বা কাজের মধ্যে। মা গীতা বরং হাসিখুশি স্বভাবের ছিলেন, পরিবার নিয়ে হুল্লোড় করে জীবন কাটাতেন।
গীতা অবশ্যই মিশুকে ছিলেন, না হলে যে ওয়াহিদা রেহমানের সঙ্গে গুরুর প্রেমের রটনায় ইন্ডাস্ট্রি গমগম করত, 'সাহেব বিবি অউর গুলাম'-এর মহরতে তাঁকেই আটপৌরেভাবে বাঙালি শাড়ি পরিয়ে দিতে আসেন? তখন গুরু এবং গীতা একসঙ্গে থাকেনও না! সেই না থাকার অছিলাও সুন্দরভাবে তৈরি করেছিলেন গীতা। ৪৮ নং

গীতা অবশ্যই মিশুকে ছিলেন, না হলে যে ওয়াহিদা রেহমানের সঙ্গে গুরুর প্রেমের রটনায় ইন্ডাস্ট্রি গমগম করত, 'সাহেব বিবি অউর গুলাম'-এর মহরতে তাঁকেই আটপৌরেভাবে বাঙালি শাড়ি পরিয়ে দিতে আসেন?

পালি হিলে গুরু দত্ত বাংলো কিনেছিলেন। বড় শখ করে। বিরাট সেই বাংলোতে গীতা থাকতেই চাইলেন না। অজুহাত, বাংলো ভূতুড়ে! বাড়ির পাশের গাছ থেকে সেই ভূত বাড়ি অবধি চলে আসে! এই গল্পের রূপকে মুড়ে তিনি যে দাম্পত্য সম্পর্কে তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতির কথা বলেছিলেন, তা আজকের দিনে দাঁড়িয়ে ভালই বোঝা যায়। তিনি ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন মায়ের বাড়িতে। সেই দুঃখ ভুলতে পারেননি গুরু দত্ত। নিজের জন্মদিনে (৯ জুলাই, ১৯৬৩) বাড়ি ভেঙে ফেললেন! চলে গেলেন পেডার রোডের ভাড়া বাড়িতে।

জানে উয়ো ক্যায়সে লোগ থে

'পিয়াসা' ছবিটা ক্লাসিকের মর্যাদা পেয়েছে অনেক পরে। প্রথম দিকে দর্শকের ভালবাসা, সমালোচকদের মন, কোনওটাই পায়নি। সেই বছরই মুক্তি পায় 'মাদার ইন্ডিয়া', সেই ঝড়ে চাপা পড়ে গিয়েছিল ছবিটি। গুরুর মনোবল অনেকটাই ভেঙে পড়েছিল তাতে। তারপর আবার 'কাগজ় কে ফুল' মুখ থুবড়ে পড়ে। নয়্যার ট্র্যাজেডি সেই সময়ের চেয়ে অনেক এগিয়ে ছিল, সেটাও মেনে নিতে পারেননি গুরু। ফলে তিনি আর ছবি পরিচালনার সাহস দেখাননি। ওই যে বললাম, অন্যদের কথা একটু বেশিই ভাবতেন তিনি! ফলে যে-কাজটা তিনি করতে চাইতেন না, সেই অভিনয়কেই বেছে নিয়েছিলেন। নিজের পরিচালনায় তো গুরু কখনওই অভিনয় করতে চাননি। 'পিয়াসা'র জন্য তাঁর পছন্দ ছিলেন দিলীপকুমার, সেই সময় তিনি ট্র্যাজেডি কিং! কিন্তু মহরতের দিন দিলীপ এলেনই না। মা বাসন্তী গুরুকে বলেন, এভাবে পুজোর মহরত নষ্ট না করে গুরুই যেন শট দিয়ে সিনেমা শুরু করেন। হলও তাই। সেভাবেই নতুন 'ট্র্যাজেডি কিং'-এর আগমন হিন্দি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে। মিউজ়িকের ক্ষেত্রেও ও পি নাইয়ারের চেনা ছন্দের জায়গায় আস্থা রেখেছিলেন শচীন দেববর্মণের মেলোডির উপর। নিজের প্রযোজনা সংস্থার হয়ে 'চৌধভিঁ কা চান্দ' এবং 'সাহেব বিবি অউর গুলাম' তৈরি করে জলে যাওয়া টাকা উদ্ধার করলেন গুরু, পরিচালকের আসন থেকে সরে গিয়ে। 'কাগজ় কে ফুল'-এর পর আসলে লোনাভলার ফার্মহাউজ়, গাড়ি, স্টুডিয়ো সব বন্ধক রাখতে হয়েছিল গুরুকে। একটি শট পছন্দ না হওয়া অবধি শট নিয়েই যেতেন তিনি! 'পিয়াসা'-র একটি দৃশ্যের জন্য নিজেই ১০৭টি রি-টেক

দিয়েছিলেন গুরু! ফলে অন্য প্রযোজক কী করেই বা গুরুর সঙ্গে কাজ করবেন? তিনি যেমন ধীরগতিতে ছবি শুট করতেন, তার জন্য তাঁকে প্রযোজনায় নামতেই হত।

ইয়ে দুনিয়া অগর মিল ভি জায়ে তো কেয়া হ্যায়?

‘সাহেব বিবি অউর গুলাম’-এর জন্য বহুদিনের সহকর্মী, লেখক আব্রার আলভিকে পরিচালনার দায়িত্ব দেন গুরু। আব্রার আলভি, সিনেমাটোগ্রাফার ভি কে মূর্তি, সঙ্গীতকার ও পি নাইয়ার, অভিনেতা জনি ওয়াকার, ওয়াহিদা রেহমান, গায়িকা গীতা দত্তর মতো অনেকেই বড় হয়েছেন গুরুর হাত ধরেই। আব্রার আলভিকেই দুঃখ করে গুরু বলেছিলেন, ‘পরিচালক হতে চেয়েছিলাম, হয়ে গেলাম। ভাল সিনেমা বানাতে চেয়েছিলাম, বানিয়ে ফেলেছি। আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না।’ সাধ করে কেনা বাংলো তখন ভেঙে ফেলেছেন। স্ত্রী, সন্তানেরা দূরে থাকেন। তবে শুধু একাকিত্বের দিনের কথাই বা কেন বলছি। বিষাদ গুরুকে এমন এমন সময় গ্রাস করেছে, যখন আশাপ্রদীপ দিব্যি জ্বলছিল। যেমন প্রথমবার তিনি আত্মহননের চেষ্টা করেন ‘বাজ়ি’ মুক্তি পাওয়ার পর! বুঝুন, ছবি সফল, প্রেমজীবন সফল, কিন্তু বিষাদে গুরু। সেবার গুরুকে জীবনের পথে ফিরিয়েছিলেন বন্ধু দেব আনন্দ। সেই জন্য দেবকে ছেলের মতো ভালবাসতেন গুরুর মা বাসন্তী। দ্বিতীয়বার আবার মৃত্যুর পথে তিনি এগিয়ে যান ‘পিয়াসা’ ছবিটি তৈরি করার সময়। নিজের স্বপ্নের ছবি তৈরি করছেন, এদিকে একটু-একটু করে ডুবে যাচ্ছেন বিষাদে। সুরা এবং ঘুমের ওষুধ

> পরের দিন মালা সিনহা এবং মেহবুব খানের সঙ্গে মিটিংয়ে বসার কথা ছিল গুরুর। তিনি সুরা এবং ঘুমের ওষুধের মিশ্রণে মাত্রা বুঝতে পারেননি, এমনটা বলে পরিবার...

খাওয়া গুরুকে হাসপাতালে নিয়ে ছুটেছিলেন বোন ললিতা ও ভাই দেবী। জ্ঞান ফেরার গুরু পর প্রথম যে নামটি নিয়েছিলেন, তা গীতার! অথচ গৃহকলহ তখন তুঙ্গে! কে বলবে ভালবাসা জটিল নয়?

তৃতীয় বার আর সুযোগ দেননি কাউকে, এই বৈষয়িক দুনিয়ায় ফেরানোর। এই অর্থপিপাসু দুনিয়া, যেখানে শিল্পের বেঁচে থাকাই দায়। গুরুর পরিবার এই মৃত্যুকে আত্মহত্যা ভাবে না। অন্তত স্বীকার করে না। দেবী দত্তর কথায়, পরের দিন মালা সিনহা এবং মেহবুব খানের সঙ্গে মিটিংয়ে বসার কথা ছিল গুরুর। তিনি সুরা এবং ঘুমের ওষুধের মিশ্রণে মাত্রা বুঝতে পারেননি। বহুবছর আগেই ঘুম গুরুর হাত ছেড়ে দিয়েছিল। মাথায় চলত নানারকমের চিন্তা, শৈল্পিক হোক বা অন্য কিছু। মাত্র ৩৯ বছর বয়সে গুরু দত্ত এই দুনিয়া ছেড়ে চলে যান। তাঁর ছবির গানের মতো যে দুনিয়া...
‘ইয়ে ইনসাঁ কে দুশমন/সমাজো কী দুনিয়া
ইয়ে দৌলত কে ভুকে/ রিওয়াজোঁ কী দুনিয়া’

ও হ্যাঁ, আর একটা বিষয় বড্ড কাকতালীয়। গুরু ও গীতার বড় ছেলে তরুণও খুব কম বয়সে অ্যালকোহলিক হয়ে পড়েন এবং অবশেষে আত্মহত্যা করেন। তরুণের জন্মদিন কবে জানেন? ৯ জুলাই। গুরু দত্তর জন্মদিনেই। গুরুকে যেমন তাঁর বাবা ছেড়ে যাননি ব্যক্তিত্বে, গুরুও ছেলেকে ছাড়লেন না। কে বলে বিষাদ রক্তে বয় না?



■ বিষাদগ্রস্ত জিনিয়াস গুরু দত্ত

তথ্যসূত্র:

থ্যাঙ্ক ইউ! গুরু দত্ত, লতা জগতিয়ানি

গুরু দত্ত: আ লাইফ ইন সিনেমা, নাসরিন মুন্নি কবীর

গুরু দত্ত: গ্রু লাইট অ্যান্ড শেড, লক্ষ্মী দোরাইস্বামী



কলকাতার বাড়ির বারান্দায় গুরু দত্ত। বাড়ির এই জায়গাটি ছিল তাঁর সবচেয়ে প্রিয়

বাঙালি সত্তার নায়ক

জন্মশতবর্ষে দাঁড়িয়েও তিনি বাঙালি ছিলেন কিনা, তা নিয়ে একটা প্রাথমিক দ্বিধা তৈরি হয়। সেটা কি শুধু পদবির কারণে? বোধ হয় নয়। লিখেছেন **পায়েল সেনগুপ্ত**

কে ভুলতে পারে ‘পিয়াসা’ ছবির সেই ঐতিহাসিক দৃশ্য! হলভর্তি লোকের সামনে প্রতিবাদ করে নায়ক বলছে, ‘ইয়ে মহেলো, ইয়ে তখতো, ইয়ে তাজো কী দুনিয়া/ ইয়ে ইনসাঁ কী দুশমন সমাজো কী দুনিয়া/ ইয়ে দওলত কে ভুখে রিওয়াজো কী দুনিয়া/ ইয়ে দুনিয়া অগর মিল ভি জায়ে তো কেয়া হ্যায়’... কোন দুনিয়া? লোভ, প্রতিশোধ আর হিংসার দুনিয়া, যেখানে আক্ষরিক অর্থেই আমরা আজ বাস করছি। ১৯৫৭ সালের ‘পিয়াসা’ ভারতীয় চলচ্চিত্রের একটি মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া ছবি। গ্ল্যামার পৃথিবীর সামাজিক, মানসিক প্রেক্ষাপটকে তুলে ধরার পাশাপাশি এই ছবি আরও একটি জিনিস উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। এই ছবির নায়কের মনের ক্যানভাস। সেই ক্যানভাস জুড়ে ছিল শহর কলকাতা, বাঙালি সংস্কৃতি, বাংলার মাটি ও হৃদয়ের আনাচকানাচ। এইসব টুকরো একত্র হয়ে যেন একটা দরজা খুলে দিলেন ছবির প্রযোজক, পরিচালক ও প্রটাগনিস্ট, যিনি জন্মসূত্রে বাঙালি না হয়েও পছন্দ করতেন তাঁর বাঙালি কায়দায় লেখা ‘গুরু দত্ত’ নামটিকে! নিজের আধা বাঙালি হয়ে ওঠাকে আজীবন উপভোগ করেছেন তিনি। দক্ষিণের কোঙ্কণি ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম হয়েছিল বসন্তকুমার শিবশঙ্কর রাও পাড়ুকোনের। জন্মেছিলেন বৃহস্পতিবার, হিন্দু ধর্মীয় মতে গুরুবারে। ছেলেবেলায় একটি দুর্ঘটনার পরে তাঁর নাম বদলে করে দেওয়া হয় ‘গুরুদত্ত পাড়ুকোন’। ১৯২৫-এর ৯ জুলাই জন্ম। ওই দশকেরই শেষের দিকে বাবা শিবশঙ্কর রাও পাড়ুকোন বর্মা শেল কোম্পানিতে চাকরির সূত্রে চলে আসেন কলকাতা। সেখানেই গুরুর বড় হয়ে ওঠা, কলকাতার ভবানীপুরে। প্রথমে ভাড়া থাকতেন পদ্মপুকুরের এক ফ্ল্যাটে, সেখান থেকে অ্যাস্টন রোড ও তারপর ভবানীপুর। মা বাসন্তীদেবীও খুব ভাল বাংলা বলতে ও লিখতে পারতেন। যাত্রার প্রতি এক অদ্ভুত টান ছিল গুরুর। বাড়ির আশপাশেই বিভিন্ন জায়গায় পালা দেখে এসে আবার বাড়িতে অভিনয় করে দেখাতেন। বাউল-কীর্তন গায়কদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়তেন। আবার সন্ধ্যারতির সময় ঠাকুরমা যখন প্রদীপ জ্বালাতেন, আঙুল দিয়ে আলো-



ছোট্ট গুরু মায়ের কোলে

ছায়ার খেলা দেখাতেন দেওয়ালে। সেই সময়কার কলকাতা, বাংলার সংস্কৃতি আর হয়তো এই আলো-ছায়ার খেলা থেকেই ছায়াছবির জগতে আসার আকাঙ্ক্ষার সূত্রপাত তাঁর। পারিবারিক আত্মীয়, সম্পর্কে মামা বি বি বেনেগল ছিলেন ফিল্মের প্রচার সংস্থার কাজে যুক্ত। ফ্রি পাসে ধর্মতলায় দিনে প্রায় তিনটে করে সিনেমা দেখতেন ভাই বোনেরা মিলে। ক্যামেরাতেও তাঁর হাতেখড়ি হয় এই সময়েই। একদিন মামাকে দেখানো কিশোর গুরু দত্তর সাপ-নাচের ছবির সাক্ষী হয় ইডেন গার্ডেনস। এই কিশোরের প্রতিভা এবং সম্ভাবনার বিষয়ে অনেকেই সেদিন

উদয়শঙ্কর আলমোড়াতে নিজের অ্যাকাডেমিতে ভর্তি করে নেন গুরুকে। সেখানেই প্রথম তাঁর নাম বাঙালি কৌশলে ‘গুরু দত্ত’ লেখা হয়েছিল, কলকাতা থেকে...



গীতাকে বিয়ের পর একদিন বাড়িতে



ভিতরে-ভিতরে বঙ্গতনয় হয়ে ওঠার ইচ্ছেকে প্রশ্রয় দিতেন গুরু দত্ত



বাঙালি জীবনকেই ভালবেসেছেন তিনি

নিঃসংশয় হন। বি বি বেনেগলের সূত্রেই নৃত্যাচার্য উদয়শঙ্করের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে তাঁর। ছেলেটির শিল্পবোধ দেখে বেশ অবাকই হয়েছিলেন উদয়। তাঁকে আলমোড়াতে নিজের অ্যাকাডেমিতে ভর্তি করে নেন। শোনা যায়, সেখানেই প্রথম তাঁর নাম বাঙালি কৌশলে ‘গুরু দত্ত’ লেখা হয়েছিল, কলকাতা থেকে আসা বাঙালি মনে করে। কোনও আপত্তি করেননি তিনি, হয়তো ভিতরে-ভিতরে বঙ্গতনয় হয়ে ওঠার ইচ্ছেকে প্রশ্রয় দিচ্ছিলেন। সেখানে অবশ্য খুব বেশি দিন থাকেননি গুরু। কলকাতায় ফিরে এসে একটি ছোট চাকরিতে যোগ দেন।

কেরিয়ারের পরের ইনিংস শুরু হয় পুণেতে। ভি শান্তারামের প্রভাত ফিল্ম কোম্পানিতে কনট্র্যাক্টে যোগ দেন গুরু। নতুন প্রোডাকশন কোম্পানিতে রাজকমল কলামন্দিরেই তাঁর সঙ্গে আলাপ হয় দেব আনন্দ এবং রহমানের, পরবর্তীকালে যাঁরা আজীবনের বন্ধু হয়ে যান। এর পর তিনি দুই বাঙালি পরিচালকের সঙ্গে পরিচিত হন, অমিয় চক্রবর্তী এবং জ্ঞান



■ ওয়াহিদার সঙ্গে ছবির সেটে



■ সিনেমার সেটেই একবার গুরুর সঙ্গে তুমুল ঝগড়া হয় গীতা দত্তর

মুখোপাধ্যায়। বাঙালি জীবনের এই দুই গুরুর সূত্রেই গুরু দত্তর ফিল্মের মূল স্রোতে এসে পড়া শেষ পর্যন্ত। প্রথমজনের সঙ্গে তিনি কাজ করেছিলেন 'গার্লস স্কুল' বলে একটি ছবিতে। আবার বম্বে টকিজ়ে জ্ঞান মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কাজ করলেন 'সংগ্রাম' ছবিতে। এর পর-পরই বন্ধু দেব আনন্দ তাঁকে 'নবকেতন ফিল্মসে' কাজের অফার দেন। গুরুর পরিচালনায় তৈরি হয় প্রথম ছবি 'বাজ়ি'। দেব আনন্দ সেই ছবির নায়ক এবং সঙ্গীত পরিচালক আর-এক স্বনামধন্য বাঙালি, শচীন দেববর্মণ। সবচেয়ে বড় কথা, ১৯৫১ সালে এই ছবিরই গানের রেকর্ডিংয়ে গুরুর সঙ্গে প্রথম কাজ গীতা রায়চৌধুরীর, পরে যাঁর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে বেশি সময় লাগেনি। এত ঝরঝরে বাংলা বলা শুনে গীতা এবং তাঁর বাবা ভেবেই নিয়েছিলেন যে, গুরু হয়তো বাঙালিই। তাঁদের বিয়েও হয় সম্পূর্ণ বাঙালি মতে। 'বাজ়ি'র পরের ছবি 'জাল'। ফিল্ম তো হিট বটেই, গানেও ঝড় তুলেছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও গীতা। গুরুর ফিল্মোগ্রাফিতে এর পর আরও অনেক ছবির নাম জুড়েছে।

কিন্তু 'পিয়াসা'-তে এসে সেই শিকড়ে ফেরা নায়ক, পরিচালক ও প্রযোজকের। প্রথমে এই ছবির নায়কের চরিত্র অফার করা হয়েছিল দিলীপকুমারকে। কিন্তু তিনি ততদিনে 'দেবদাস' করে ফেলেছেন এবং এই ছবির নায়ক 'বিজয়'কে তাঁর অনেকটা 'দেবদাস'-এর মতোই মনে হয়েছিল। পরে দিলীপকুমার নিজেই বলেছিলেন, যেসব চরিত্র প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাঁর আফসোস আছে, 'পিয়াসা' তার মধ্যে অন্যতম। এই ছবির প্রেক্ষাপটে উঠে এল শহর কলকাতা, গঙ্গা, প্রিন্সেপ ঘাট, হাওড়া ব্রিজ... বাংলার সত্তাকে যেন নতুন করে বিশ্বের দরবারে নিয়ে এলেন গুরু। একটি ছোট চরিত্রে ছিলেন তুলসী চক্রবর্তীও। ছবির চরিত্র হয়ে উঠেছিল স্টিমার, নৌকো আর উড়ে যাওয়া পায়রারা, রাতের অন্ধকারে উত্তর কলকাতার গলি ঘুঁজি। কলকাতার এক উর্দু কবি, সৃষ্টিকে ঘিরে যার অনেক স্বপ্ন। তারপর সেই স্বপ্নের ভিত নড়ে যাওয়া, একজন দেহপসারিণীর কাছে মর্যাদা পাওয়া... এই প্লটও তো বাংলার একান্ত নিজস্ব। সাহিত্যের প্রতি এত প্রেম বাংলা ছাড়া আর কোথায়ই বা দেখি তেমন করে? ছেলেবেলার সেই বাউল-কীর্তনের গানের প্রভাবও এসেছিল শচীন দেববর্মণের কম্পোজ়িশনে। এই সিনিয়র সঙ্গীত পরিচালকের সাফল্যের ঝুলিতেও বৈচিত্রের দিক থেকে 'পিয়াসা'

৪১ বছর বয়সে লিভার ড্যামেজ করে মারা গেলেন গীতা দত্ত। গুরু দত্ত চলে গিয়েছিলেন ৩৯ বছর বয়সে। দু'জনকে আলাদা করা মুশকিল, কারণ...

একটি অনন্য অ্যালবাম। মনের চালচিত্রে বাংলার সাহিত্যও খোদাই হয়ে গিয়েছিল কোথাও। 'পিয়াসা'র পরেও আবার বাংলা সাহিত্য নিয়ে ছবি তাঁর। 'সাহেব বিবি অওর গুলাম।' ততদিনে বাংলাতেও হয়ে গিয়েছে এই ছবি, ভূতনাথ চক্রবর্তীর চরিত্রে আর কেউ নন, ছিলেন স্বয়ং উত্তমকুমার। বাঙালিমনস্ক গুরুর কাছে এই একই চরিত্রে অভিনয় করা একটা চ্যালেঞ্জও তো বটে। তার কারণ বাঙালি দর্শকের জনপ্রিয়তা ও ছবির বক্স অফিস। ছোট চরিত্রে ছিলেন

হারিন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। সত্যজিৎ রায়ের ‘জলসাঘর’ও হয়তো মিশে গিয়েছিল কোথাও এই ছবির মেকিংয়ে, পুরনো কলকাতার বাবু কালচারকেও আত্মস্থ করতে হয়েছিল। এবারে সঙ্গীতে থাকলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। কিন্তু অদ্ভুতভাবে গীতার উপস্থিতি কম। কারণ ততদিনে শুরু হয়ে গিয়েছে গীতা ও গুরুর মনোমালিন্য। সে প্রসঙ্গ থাক। ছবির চিত্রনাট্য তৈরি করতে ডেকেছিলেন স্বয়ং লেখক বিমল মিত্রকেই। পরে কাস্ট অ্যান্ড ক্রু-এর জন্য হিন্দি অনুবাদের একটা টিম তৈরি করেছিলেন তিনি। ততদিনে বক্স-অফিস সফল বেশ কিছু ছবি করে তিনি সামলে উঠতে পেরেছেন ফ্লপ অথচ আন্তর্জাতিক মাপকাঠিতে ‘কাল্ট’, ‘কাগজ় কে ফুল’-এর আর্থিক ক্ষতি। তাঁর প্রিয় সঙ্গী আবরার আলভি ‘সাহেব বিবি অওর গুলাম’ ছবির জন্য পুরস্কৃতও হয়েছিলেন। কিন্তু গুরুর জীবন চিত্রনাট্যে যে আর খুব বেশি সময় বাকি নেই, তা হয়তো কেউই সেদিন বুঝতে পারেননি। গুরু দত্ত নিজেও না।

‘গৌরী’ বলে বাংলার পটভূমিকায় একটি বাংলা ছবি করার ইচ্ছে ছিল গুরু দত্ত-র।



‘মিস্টার অ্যান্ড মিসেস ৫৫’ ছবির একটি দৃশ্য

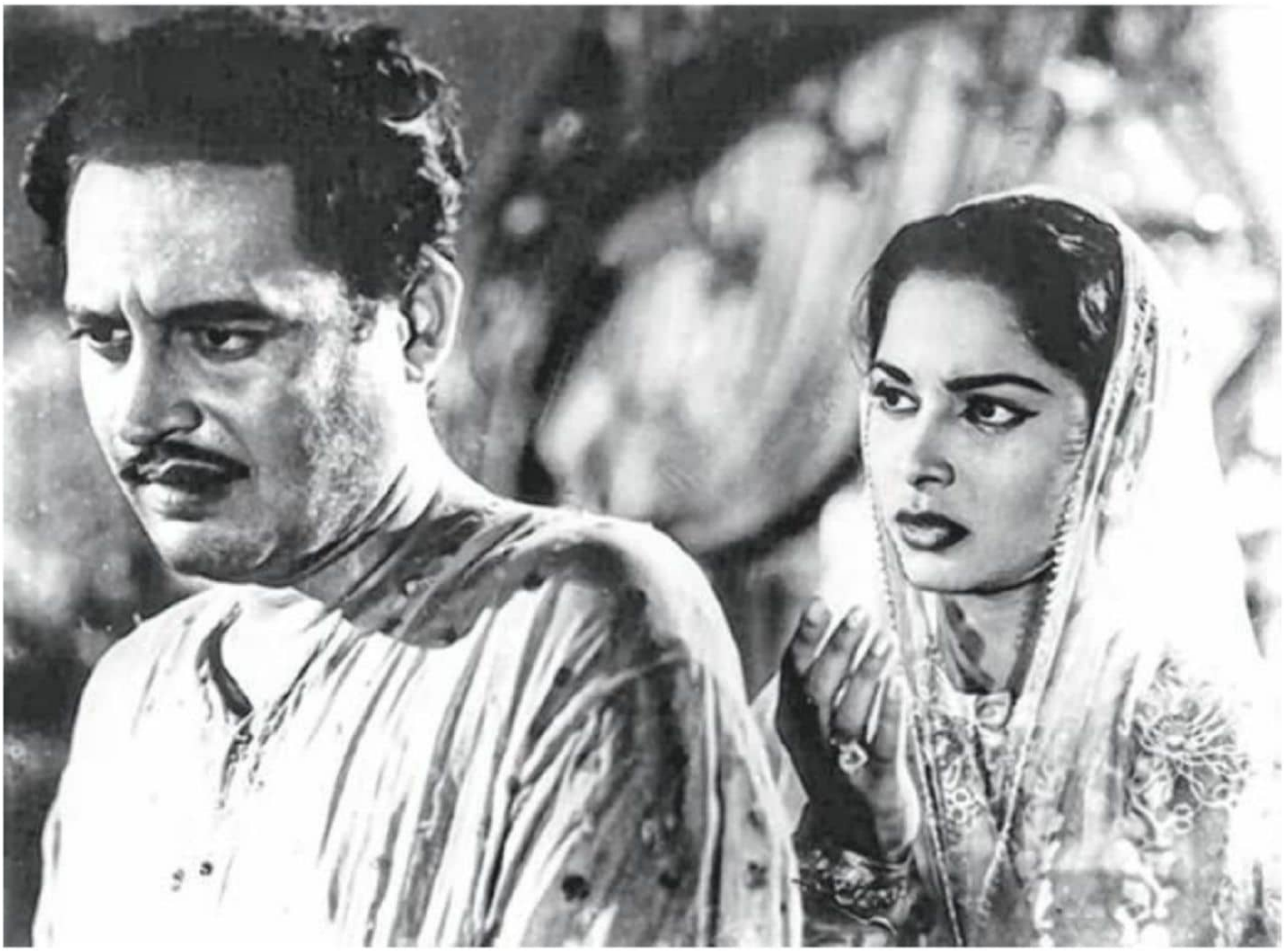
তাতে নায়িকার ভূমিকায় স্থির করেছিলেন স্ত্রী গীতাকে। বান্দ্রার পালি হিলের বাসায় কিছু টেস্ট শট শুট করা হয়েছিল। ছবির চিত্রনাট্য ছিল গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের। কিন্তু ওয়াহিদা রহমানের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে মনোমালিন্য চরম পর্যায়ে যাওয়ায় কলকাতায় শুট শুরু হওয়ার



বাংলার সত্তাকে নতুন করে বিশ্বের দরবারে নিয়ে এসেছিলেন গুরু দত্ত

পরেও, তা বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৬৪-র অক্টোবরে গুরু দত্তকে তাঁর ঘরে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়, যা আত্মহত্যা হতেও পারে অথবা ট্র্যাঙ্কুলাইজ়ারের ওভারডোজ়। কিন্তু এই মৃত্যু ছিন্নভিন্ন করে দেয় স্ত্রী গীতাকে। গুরু এবং গীতা সেইসময় সেপারেশনে ছিলেন। নিজের ফ্ল্যাটে একা ছিলেন তিনি। হাতে তখনও বেশ কিছু ছবির কাজ, পর পর মিটিংয়েরও কথা। কিন্তু চলে গেলেন সব ফেলে!

ভালবাসা কী বিষম বস্তু! যাঁর সঙ্গে অশান্তি, তাঁর মৃত্যুতেই প্রায় একইরকমভাবে নিজেকে ধ্বংস করে দিলেন স্ত্রী গীতা দত্ত। কয়েকটা বছর বেঁচেছিলেন ঠিকই, অতিরিক্ত নেশায় ১৯৭২-এ ৪১ বছর বয়সে লিভার ড্যামেজ করে মারা গেলেন গীতা দত্ত। গুরু দত্ত চলে গিয়েছিলেন ৩৯ বছর বয়সে। দু’জনকে আলাদা করা মুশকিল, কারণ সকলেই জানেন গুরু দত্তের সাফল্যের পিছনে কী প্রাণপণ পরিশ্রম ও অবদান ছিল গীতার। তাঁর বক্স অফিস সফল ছবিগুলিতে একের পর এক গীতার হিট গান, সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে নতুন জাদুকর ও পি নায়ারকে তুলে আনা, প্রতিটি ফিল্মে গুরুত্বপূর্ণ মতামত দেওয়া... গীতা ছাড়া অসম্ভব ছিল। ‘জওয়ানি ভটকতি হ্যায়, বড় কর, বন কর/ জওয়াঁ জিসম সজতে হ্যায় বাজ়ার বন কর/ ইয়াহাঁ পেয়ার হোতা হ্যায় বেপার বন কর/ ইয়ে দুনিয়া অগর মিল ভি জায়ে তো ক্যায়া হ্যায়...’’ একইরকম উদাসীনতায় চলে গেলেন দু’জনে, গুরু দত্ত ও তাঁর সবচেয়ে শক্তিশালী বাংলার সেতু গীতা দত্ত। প্রবাদপ্রতিম গীতিকার সাহির লুধিয়ানভি ‘পিয়াসা’-তে এক চিরসত্য এঁকে গিয়েছিলেন।



পুষ্প চেয়ে কণ্টকিত

প্রেম বা ভালবাসা নিয়ে বরাবরই তাঁর জীবনে ছিল দ্বন্দ্ব। ভালবেসে ঠকেছেন। এমনকি বৈবাহিক জীবনও সুখের ছিল না গুরু দত্তর। গীতার সঙ্গে প্রেম থেকে ওয়াহিদার সঙ্গে সম্পর্ক... কোন খাতে বয়েছিল তাঁর বিতর্কিত প্রেমজীবন? সেই পাতা উল্টে দেখলেন **সায়ম বন্দোপাধ্যায়**

শুটিং চলছে 'সিআইডি' ছবির। সেদিন শুট হবে ছবির একটি গান, 'কহিঁ পে নিগাহেঁ কহিঁ পে নিশানা'। তবে, পরিচালক রাজ খোসলা বেশ চিন্তিত। তাঁর আশঙ্কা, যাঁর উপর গানটি চিত্রায়িত হবে, নবাগত সেই অভিনেত্রী ওয়াহিদা রেহমান হয়তো বেঁকে বসবেন কস্টিউম তাঁর মনমতো না-হলে। ওয়াহিদার এটিই প্রথম হিন্দি ছবি, তার আগে কয়েকটি মাত্র দক্ষিণী ছবিতে কাজ করেছেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই ওয়াহিদার শর্তাবলি একাধিক—নিজের নাম অপরিবর্তিত রেখেছেন, মধুবালা বা নার্গিসের মতো পাল্টাতে দেননি। কনট্র্যাক্টে বলে নিয়েছেন, অভিনীত ছবির বেশভূষাও তাঁর পছন্দ হওয়া প্রয়োজন। রাজের আশঙ্কা সত্যি হল। গানের সিকোয়েন্সের জন্য যে-কস্টিউম নির্ধারিত, তা পরতে সরাসরি অস্বীকার করলেন ওয়াহিদা। কারণ, ব্লাউজ় অতিমাত্রায় লেসের, একটু লাইনিংও দেওয়া নেই। ওয়াহিদার দাবি, হয় লাইনিং দিতে হবে, নয়তো তাঁকে একটা দুপাট্টা দিতে হবে। ছবির কস্টিউম ডিজ়াইনার ছিলেন ভানু আথাইয়া, উত্তরকালে 'গান্ধী' ছবির জন্য যিনি অস্কার পেয়েছিলেন। ভানু ওয়াহিদাকে বোঝালেন, বোঝালেন রাজ খোসলাও—গানটি একটি সিডাকশন সং। গানের দৃশ্যে একজন নারী এক পুরুষকে মোহাবিষ্ট করছে, প্রলোভিত করছে, ফলে কস্টিউম তেমন হওয়াই তো দরকার। ওয়াহিদা অনড়। বেগতিক বুঝে রাজ খোসলা ফোন করলেন ছবির প্রযোজক গুরু দত্তকে। গুরু তখন শহর মুম্বইয়ের বাইরে। সব শুনে তিনি চলে এলেন। তিনিও বোঝানোর চেষ্টা করলেন। ওয়াহিদার সেই একই শর্ত—লেসের ব্লাউজ় তিনি পরবেন না। হয় দুপাট্টা দিতে হবে তাঁকে, নয়তো ব্লাউজ় লাইনিং দিয়ে নিয়ে আসতে হবে।

ওয়াহিদার প্রেমে গুরু দত্ত

গুরু দত্ত বললেন, কিন্তু এ তো ভালগার নয়, স্লিভস আছে যে!

না, তাতেও হবে না।

এ দিকে সময় নেই। লাইনিং দিতে একদিন লেগে যাবে। ছবির নায়ক দেব আনন্দও পরের দিনই সুইটজ়ারল্যান্ড চলে যাবেন। অগত্যা গুরু

দত্ত মেনে নিলেন দুপাট্টার বিকল্প। চিত্রায়িত হতে পারল গানটি। এখন দেখতে গিয়ে মনে হয়, বেশ বিসদৃশই লাগছে, আড়ালে চলে গিয়েছে কস্টিউমের আবেদনটাই।
গুরু দত্ত কেন মেনে নিলেন ওয়াহিদার কথা? সেই সময়ও অনেকে আশ্চর্য হয়েছিলেন। যে-গুরু দত্ত অবিচল থাকেন নিজের প্রায় সমস্ত সিদ্ধান্তে, শুটিং চলাকালীন অন্য টেকনিশিয়ান বা অভিনেতার সঙ্গে বাক্যবিনিময়ে আকছার মেজাজ হারান, তিনি কী করে এত ধৈর্য দেখালেন একজন অখ্যাত, নবাগত অভিনেত্রীর ক্ষেত্রে—এ কথা ভাবিয়েছিল চেনাপরিচিতদের।
আগেরবারেও এমনটাই হয়েছিল, নাম পরিবর্তন নিয়ে যখন তর্কাতর্কি শুরু হয়। এই ছবির জন্যই। রাজ খোসলার মত ছিল, ওয়াহিদা রেহমান নামটি বেশ বড়, স্ক্রিন-নেম হিসেবে, তখনকার নিরিখে চলনসই নয়। মুমতাজ় জাহান বেগম দেহলভি যেমন মধুবালা হয়েছিলেন, ফতিমা রশিদ যেমন হয়েছিলেন নার্গিস, রাজের ইচ্ছে ছিল ওয়াহিদাও যেন সেরকম কোনও এক শব্দের নাম নেন। ইন্ডাস্ট্রিতে একেবারে নতুন হওয়া সত্ত্বেও ওয়াহিদা এসব নির্দেশকে পাত্তাই দিলেন না। উপরন্তু, ঔদ্ধত্য দেখিয়ে বললেন, ওঁরা ওঁদের মতো, আমি আমার মতো।
খোসলা গেলেন চটে। ওয়াহিদার মাকে বললেন, আপনি একটা কাজ করুন, ওকে নিয়ে যান, আইন পড়ান। যেভাবে ও তর্ক জুড়ছে, তাতে অভিনয় না-করে আইন পড়লেই ভাল!
পাশে বসেছিলেন গুরু দত্ত। চুপচাপ দেখছিলেন, এতক্ষণ শুনছিলেন সব। খোসলা তাঁকেই বললেন, ভেবে দেখো কী করবে। তখনই কোনও সিদ্ধান্ত নেননি গুরু দত্ত, বলেছিলেন ভেবে দেখতে সময় লাগবে। পরে যদিও, ওয়াহিদার অবস্থানই বলবৎ থাকে। নাম পাল্টায় না। এতে রাজ খোসলা খুশি হননি অবশ্যই। কিন্তু গুরু দত্ত ওয়াহিদার জেদি স্বভাব ও ওয়াহিদা, দু'জনকেই ভালবেসে ফেলেছিলেন সে মুহূর্ত থেকে। এবং এখান থেকেই শুরু হবে এক ঝোড়ো জীবন, বিনষ্টির পথে এগোনো। গ্রিক নাটকের ট্র্যাজিক হিরোর মতো গুরু দত্ত এগিয়ে যাবেন ধ্বংসের দিকে। নিপাট ভালবাসা থেকে যার সূচনা, সেই পরিক্রমার সমাপ্তি হবে ব্যাখ্যাহীন শূন্যতায়।



■ 'সিআইডি'র নায়ক দেব আনন্দ ও নায়িকা ওয়াহিদার সঙ্গে গুরু দত্ত, রয়েছেন পরিচালক রাজ খোসলাও



■ 'সিআইডি' ছবির একটি দৃশ্যে দেব আনন্দ এবং শাকিলা। এই ছবিতে প্রযোজক ছিলেন গুরু দত্ত

বীজ কোথায় ছিল এর?

অনেকেই বলেন, গুরু দত্তর আবেগকে তাড়িত করত অসহায়, পতিত নারীরা। গুরু দত্তর বোন ললিতা লাজমিও লিখেছিলেন, "আই ফিল হি অলওয়েজ় হ্যাড আ কমপ্যাশন ফর 'ফলেন' উইমেন"। তাঁর 'পিয়াসা' বা 'কাগজ় কে ফুল'-এর কেন্দ্রীয় নারীরা সমাজের প্রান্ত সীমার বাসিন্দা। সম্ভবত সে-কারণেই ওয়াহিদা খুব দ্রুত গুরু দত্তর শিল্পীসত্তা, আদর্শ আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন। ওয়াহিদা যে প্রান্তিক, তা নয়। তাঁর পিতা ছিলেন ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার। কিন্তু ওয়াহিদার সদ্য-কৈশোরে পিতার হঠাৎ মৃত্যুর পর পরিবার প্রবল আর্থিক অনটনের মধ্যে পড়ে। ওয়াহিদাকেই দায়িত্ব নিতে হয় সংসারের। ডাক্তার হওয়ার ইচ্ছেকে সরিয়ে রেখে নর্তকী হিসেবে স্টেজ শো করতে হয়। তাতেও যথেষ্ট সঙ্কুলান না-হওয়ায় সিনেমায় প্রবেশ, একটি তেলুগু ছবিতে, এখনকার পরিভাষায় যাকে আইটেম সং ডান্সার বলে, তেমন এক চরিত্রে। অর্থাৎ, একটা স্ট্রাগল আছে ওয়াহিদার নেপথ্যে।
আচ্ছা, যদি ওয়াহিদাকে বাদও রাখি, তা হলেও দেখা যায়, গুরু দত্তর প্রথম প্রেমজ সম্পর্ক যে-নারীর সঙ্গে গড়ে উঠেছিল, যা বিবাহ পর্যন্তও প্রায় চলে গিয়েছিল, সে নারীর জীবনও স্বচ্ছ নয়।

প্রথম ভালবাসা

আলমোড়ায় উদয়শঙ্করের কাছে নৃত্যশিল্প শিখে আসা গুরু দত্ত তখন 'হম এক হ্যায়' নামে একটি ছবিতে কোরিয়োগ্রাফির কাজ করছিলেন। কর্মসূত্রেই পরিচয় ঘটল বিজয়া নামে এক নৃত্যশিল্পীর সঙ্গে। অনতিবিলম্বে গুরু দত্ত ও বিজয়া একে অপরের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন। গুরু দত্তর মা বাসন্তীর



■ 'সিআইডি' ছবির অভিনেতা, পরিচালক ও প্রযোজক। অর্থাৎ দেব আনন্দ, রাজ খোসলা এবং গুরু দত্ত

লেখায় আছে যে, একবার গণেশ পুজোর সময় গুরু দত্ত বিজয়াকে সঙ্গে নিয়ে দেখা করতে এসেছিলেন তাঁর সঙ্গে। পদস্পর্শ করে প্রণাম করেন দু'জন। তারপর গুরু দত্ত মায়ের সঙ্গে বিজয়ার পরিচয় করিয়েছিলেন ভাবী পুত্রবধূ হিসেবে। পরিবারের সকলেই খুশি হয়েছিলেন এই পরিণতিতে। গোলযোগ দেখা দিল পরের দিনই। বাসন্তীর কাছে একটি টেলিগ্রাম আসে পুণের এক আইনজীবীর কাছ থেকে। তিনি তাতে জানিয়েছেন যে, গুরু দত্ত বিজয়াকে নিয়ে পালিয়েছে! তিনি আইনি পদক্ষেপ করতে চলেছেন। কিন্তু এই আইনজীবীর সঙ্গে বিজয়ার কী সম্পর্ক?

কিছু পরেই জানা যায়, বিজয়া ওই আইনজীবীর রক্ষিতা! আর এ কথা বাসন্তীর কাছে এসে জানিয়ে যায় স্বয়ং সেই আইনজীবীর স্ত্রী, যিনি বিজয়া ও গুরু দত্তর অবিলম্বে বিবাহ দিতে অতি উদ্যোগী হয়ে পড়েছিলেন যাতে তাঁর স্বামীর জীবন থেকে বিজয়া সম্পূর্ণ বেরিয়ে যেতে পারেন। সম্পর্ক ও বিয়ে, দুটোই ভেস্তে গেল গুরু দত্তর।

মা বাসন্তী বুঝতে পারছিলেন, মারাত্মক ভেঙে পড়েছেন পুত্র। দেরি না-করে এক আত্মীয়র কন্যা, সুবর্ণার সঙ্গে বিয়ে ঠিক করলেন। গুরু দত্ত পছন্দও করলেন পাত্রীকে। পত্র বিনিময় শুরু হল তাঁদের। ভালই চলছিল, অকস্মাৎ একদিন সুবর্ণার পরিবার গুরু দত্তর সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ ছিন্ন করল। কী হল এমন? যা হয়েছিল তাতে অন্তত তখনই এটুকু বোঝা যাচ্ছিল যে, গুরু দত্তর একটা প্রবণতাই ছিল, নিজের দুর্ভাগ্য খনন করে নিয়ে আসা। এ ক্ষেত্রে তিনিই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সুবর্ণার পিতাকে বিজয়ার কথা জানিয়েছিলেন। ব্যস! ওতেই সব শেষ। ফিল্মজগতের লোকদের চরিত্রধর্মের কোনও ঠিক নেই, এ ধারণার বশবর্তী হয়ে সুবর্ণার পাত্র পাল্টে দিয়েছিলেন তাঁর পিতা। গুরু দত্তর যে-প্রবণতার কথা বলা হল, সেটি তাঁকে শেষ পর্যন্ত তাড়া করে বেড়িয়েছে। খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে দু'টি সম্পর্ক এভাবে নষ্ট হয়ে যাওয়া হয়তো তাঁর ভিতর এক ব্যর্থতাবোধেরও জন্ম দিচ্ছিল। কিন্তু তিনি তাঁর আবেগ-অনুভূতি ঢেকে রাখতে পারতেন, ঢেকে রাখতে জানতেন। পরিবর্তে নিমগ্ন হয়ে যেতেন অতল বিষাদে, মেলানকলিয়ায়। গীতা, গীতা ঘোষ রায়চৌধুরী, ছিলেন ঠিক একই রকম এক চরিত্র।

গুরুর জীবনে গীতা

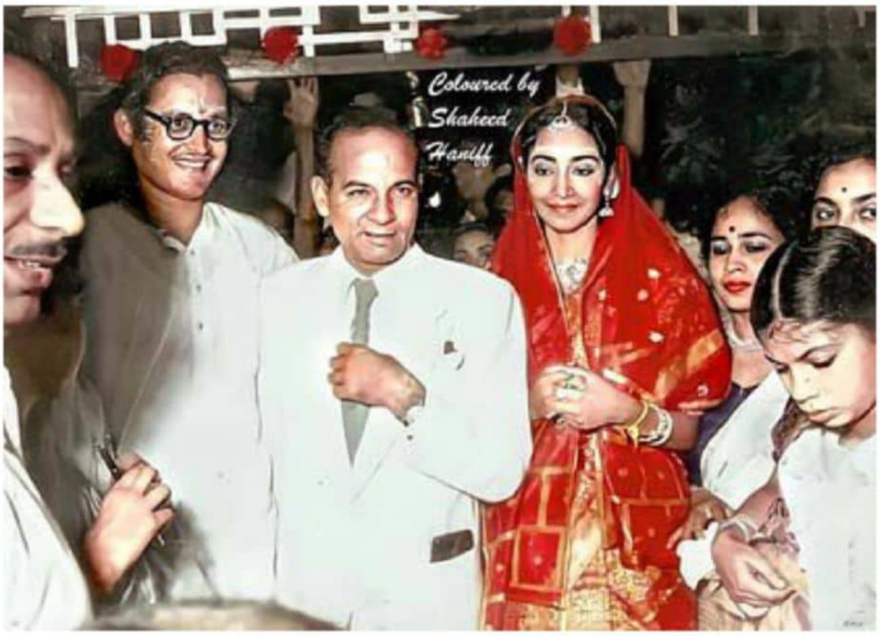
গীতাকে যখন প্রথম দেখেছিলেন গুরু দত্ত,



■ বিয়ের পর গীতা ও গুরু (উপরে), 'সাহেব বিবি অউর গুলাম'-এর দৃশ্যে ওয়াহিদার সঙ্গে গুরু দত্ত (নীচে)



তখন গীতা মুম্বই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির একজন তারকা সঙ্গীতশিল্পী। সে-সময়ের হিসেবে প্রচুর তাঁর উপার্জন। যেখানে গুরু দত্ত তখনও যাতায়াত করেন বাসে বা ট্রেনে, গীতা সেখানে লিমুজ়িন চেপে ঘোরাফেরা করেন। বহু প্রতিবেদনে এসব লেখা হলেও, একথা সত্য নয়। কারণ গীতা তারকা হয়ে ওঠার অনেক আগেই গুরুর সঙ্গে তাঁর আলাপ। বম্বের হিন্দু কলোনিতে একই পাড়ায় থাকতেন তাঁরা। তবে বিত্তশালী পরিবারের সন্তান গীতা, অবিভক্ত বাংলার ফরিদপুর জেলার এক জমিদার বংশে জন্ম তাঁর।
তবে কর্মক্ষেত্রে শচীন দেব বর্মণের স্টুডিয়োতে প্রথম সাক্ষাৎ হয় গীতা ও গুরু দত্তর, গুরু দত্ত পরিচালিত ছবি 'বাজ়ি' ছবির গান রেকর্ডিংয়ের সময়। গীতা স্বচ্ছন্দে চলে আসেন গুরু দত্তর বাড়িতে, তাঁর মাকে মাসিমা সম্বোধন করতেন গীতা। গুরুর বোন ললিতা গীতার খুবই ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। গুরুর পরিবারের সঙ্গে বসে একত্রে খাওয়াদাওয়াও করতেন গীতা। তবে, গীতা দত্তর পরিবার গুরু দত্তর সঙ্গে গীতার সম্পর্ক নিয়ে একদমই উৎসাহী ছিল না। তাদের চোখে গুরু দত্তর কোনও স্থায়িত্ব ছিল না, না ছিল অর্থনৈতিক জোর। তারাও, সুবর্ণার পিতার মতো, একজন তথাকথিত সৎপাত্র চেয়েছিলেন। তাদের সন্ধানে ছিল একজন বাঙালি যুবকও। শেষ পর্যন্ত যদিও তাদের বিরোধিতা টেকেনি গীতার ইচ্ছের সামনে। তিন বছর প্রণয়কালের পর, ১৯৫৩ সালে বিবাহ হয় গীতা ও গুরু দত্তর। লোকে তখনও বলেছিল, গুরু দত্ত নাকি স্রেফ গীতার অর্থ ও খ্যাতির কারণেই তাঁকে বিয়ে করেছে!
যদিও বিয়ের কিছু সময় পরই সমস্যা দেখা দিতে লাগল ওঁদের সম্পর্কে।



■ অনেকে বলত, গুরু দত্ত শুধুমাত্র গীতার অর্থ ও খ্যাতির কারণেই তাঁকে বিয়ে করেছেন


■ ছেলের জন্মদিনে পরিবারের সকলের সঙ্গে গুরু দত্ত। ছবিতে রয়েছে তাঁর তিনি ছেলেমেয়েই

বৈবাহিক সম্পর্কে ভাঙন

প্রথমত, গুরু দত্ত গীতার সঙ্গীতশিল্পীর জীবন এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না। এ এক আশ্চর্য ব্যাপার যে, গুরু দত্তর মতো একজন শিল্পী আর-একজন শিল্পী, যিনি ঘটনাচক্রে তাঁরই স্ত্রী, তাঁর শিল্প স্তব্ধ করতে চাইছিলেন। সাহিত্যিক বিমল মিত্র সপাটে বলে দিয়েছিলেন গুরু দত্তকে যে, 'তুমি আসলে চাইছ গীতা যেন তোমার চেয়ে বেশি খ্যাতিমান না-হতে পারে!'
উত্তর গুরু বলেছিলেন, 'না, এ কথা ঠিক নয়। আমি তো ওকে আমার ছবিতে প্লেব্যাক করতে দিই।'
বিমল মিত্রর প্রতিক্রিয়া ছিল, 'তো? এটুকু করেই তুমি কি নিজেকে মহৎ ভাবছ নাকি?'
আসলে, গীতা ও গুরু দত্ত, দু'জনেরই ছিল ভয়ঙ্কর ইগো। কেউ কারও কাছে মাথা নত করবে না। সঙ্গে ছিল গীতার সন্দেহপ্রবণ মন। অভিনেত্রী স্মৃতি বিশ্বাসের কথায়, গীতা 'was suspicious and possessive. It wasn't her weakness, it was her nature... Guru and Geeta loved each other a lot. But a creative person wants space. He couldn't handle the possessiveness. When Geeta pestered him for attention, he'd say in jest, "Bore mat karo"।'
গুরু দত্তর মাও লিখেছিলেন, গীতার ঈর্ষাকাতরতাও ছিল। এবং লোকের কথায় কান দিতেন বড় বেশি। তাই ওয়াহিদা রেহমান নামের সুন্দরী তরুণীর আকস্মিক আবির্ভাব যখন হিন্দি ছবিতে ঘটল, আর তা যেহেতু ঘটল তাঁরই স্বামী গুরু দত্তর হাত ধরে, তখন থেকেই গীতার স্থিতাবস্থা আহত হতে থাকে। নিজেকে ক্রমশ অসুরক্ষিত ভাবতে থাকেন গীতা। ওয়াহিদার সঙ্গে গুরুর ঘনিষ্ঠতাও স্পষ্ট



■ গুরু দত্ত আচমকা, স্বেচ্ছায়, বিচ্ছিন্ন হয়ে যান ওয়াহিদার সঙ্গে। অপমানিত হন ওয়াহিদা

হতে থাকে তাঁর কাছে। ওয়াহিদার নাম শুনলেই বিরক্ত গীতা বলেন, 'কী সারাক্ষণ ওয়াহিদা-ওয়াহিদা বলে যান আপনারা! আমিও নায়িকা হতে পারি। ওয়াহিদার চেয়ে কম সুন্দরী নাকি আমি!'

এ প্রশ্নের উত্তর দিতেই যেন গুরু দত্ত নির্মাণ করতে শুরু করেছিলেন 'গৌরী' শীর্ষক ছবিটি। কলকাতায় শুটিং হওয়া এ ছবি ভারতের প্রথম সিনেমাস্কোপ ছবি হওয়ার কথা ছিল। কাজ অনেকটাই এগিয়েছিল। হঠাৎ একদিন, সেটে একটি সিনের আগে মেক আপ নিয়ে গুরু দত্ত ও গীতার এক তীব্র বাক্‌যুদ্ধের পর, ছবিটি বন্ধ হয়ে যায়। গীতা গুরুকে সেদিন বলেছিলেন, 'তুমি কী চাও আমি জানি, তুমি চাও স্ক্রিনে আমায় ওয়াহিদার চেয়ে খারাপ দেখাক।'

ব্যক্তিগত জীবন এত টালমাটাল, শিল্পজীবনও কোনও সুস্থিরতা দিতে পারেনি গুরু দত্তকে। তাঁর স্বপ্নের প্রকল্প 'কাগজ় কে ফুল' কঠোর সমালোচনার মুখে পড়েছে, পরিচালক হিসেবে তাঁকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে ভারতীয় প্রেস। প্রচণ্ড ভগ্নমন হয়ে পড়েছিলেন এতে গুরু দত্ত। এতটাই যে, তিনি স্থির করেন, আর কখনও কোনও ছবি নিজে পরিচালনা করবেন না। করেনওনি। যদিও এই ছবিটিই এখন একটি ক্লাসিক রূপে বিবেচিত হয়, শুধু ভারতে নয়, বিদেশেও।

'সাহেব বিবি অউর গুলাম' ছবির শুটিং চলাকালীন গুরু দত্ত দ্বিতীয়বার আত্মহত্যার চেষ্টা করেন! কিন্তু কেন?

ওয়াহিদাকে নিয়ে গীতা ও গুরু দত্তর দাম্পত্য বিবাদ লেগেই ছিল। ওয়াহিদাকেও ছাড়তে পারছিলেন না গুরু। সেদিক থেকে তাই 'সাহেব বিবি অউর গুলাম' ছবিটি এই তিনজনের জীবনে এক চূড়ান্ত লগ্ন। এ ছবির শুটিং চলাকালীনই গুরু দত্ত দ্বিতীয়বার আত্মহত্যার চেষ্টা করেন, আটত্রিশটি ঘুমের ওষুধ খেয়ে। এই ছবি চলাকালীনই গণপরিসরে রটে যায়, ওয়াহিদা আর গুরু দত্ত বিয়ে করছেন। খবরটা এমন ভাবে ছড়িয়ে ছিল যে, তাতে ভীষণ বিব্রত বোধ করেছিলেন গুরু নিজেই, ব্যক্তিগত জীবন প্রকাশ্যে আসা একেবারেই পছন্দ করতেন না। এই ছবির সময়ই গুরু দত্ত আচমকা, স্বেচ্ছায়, বিচ্ছিন্ন হয়ে যান ওয়াহিদার সঙ্গে। অপমানিত হন ওয়াহিদা। যে-অপমান তিনি ফিরিয়ে দেন এই 'সাহেব বিবি অউর গুলাম' ছবিই যখন ত্রয়োদশ বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হচ্ছে, সে-সময়। গুরু দত্ত ও ওয়াহিদা, দু'জনেই তখন বার্লিনে, ছবির পরিচালক আব্রার অলভি-সহ অন্যান্য কলাকুশলীর সঙ্গে।

বার্লিনে 'সাহেব বিবি অউর গুলাম' সমাদর পায়নি। ছবিটির মধ্যে কোনও গ্রহণযোগ্যতা খুঁজে পাননি সেদেশের দর্শক। ঠিক তখনই ওয়াহিদাও ইতি টানেন গুরু দত্তর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের, যোগাযোগের। গুরু দত্ত পরে তাঁর বাড়িতে ফুল নিয়ে গিয়ে দেখা করতে চাইলেও দেখা করেননি ওয়াহিদা। 'দ্য লাস্ট টাইম আই স হিম মাস্ট হ্যাভ বিন ইন বার্লিন'— জানিয়েছিলেন ওয়াহিদা। ১৯৬৩-র জুন মাসে বার্লিনে অন্তিম সাক্ষাৎ গুরু দত্ত ও ওয়াহিদার।

পরের বছর অক্টোবরের ৯ তারিখ রাত দুটো নাগাদ এক অদ্ভুত অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন গীতা দত্ত, তিনি তখন আলাদা থাকেন, তাঁদের তিন সন্তানও থাকে তাঁরই সঙ্গে। সেদিন সন্ধেবেলাতেই গুরু ফোন করে সন্তানদের তাঁর কাছে পাঠাতে বলেছিলেন। শোনেননি গীতা। এখন মনে হচ্ছে, কী যেন একটা ঘটে গিয়েছে। ভোরের অপেক্ষায় ছিলেন। ভোর হতেই ফোন করে পরিচারককে বলেন গুরু দত্তর ঘরে গিয়ে দেখতে। পরিচারক ঢুকে দেখেন, গুরু দত্ত শুয়ে আছেন, চোখ অর্ধেক বন্ধ। দেহে আর প্রাণ নেই। পাশে খোলা একটা বই আর একটা গ্লাস। গ্লাসে রঙিন তরল। পরিচারকের স্মরণে আসে, শেষ রাতে একটি আস্ত হুইস্কির বোতল চেয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন গুরু দত্ত। তারপর কী হয়েছে, কে জানে!

মাত্র ঊনচল্লিশ বছর বয়স হয়েছিল গুরু দত্তর। ওই স্বল্পজীবনেই গাঢ় এক বিষণ্ণতা তাঁকে গ্রাস করেছিল। নিস্তার দেয়নি তাঁকে, তিষ্ঠতেও দেয়নি। ভালবাসা-প্রেম-নারী তাঁকে শান্তি দেয়নি, আশ্রয় দেয়নি। বরং আরও বেশি আত্মধ্বংসী করে তুলেছে। তাঁর অগোছালো, অস্থির জীবন তাঁর শিল্পে ঢুকে পড়ে বিধ্বস্ত করেছে, স্তব্ধ করে দিয়েছে শিল্প-সৃজনকে। গুরু দত্ত নিজেও বুঝে উঠতে পারেননি, তিনি কী চেয়েছেন, কিসে আছে তাঁর জীবনের আনন্দ। হয়তো শুধু বুঝেছিলেন, তাঁরই পরিচালিত ছবিতে সাহির লুধিয়ানভি-র ভাষা—'হমনে তো জব কলিয়াঁ মাঙ্গি, কাঁটোঁ কা হার মিলা'।

ঋণ: ইয়াসের উসমান, অরুণ খোপকর, নসরিন মুন্নি কবীর



দেব আনন্দ ও গুরু দত্ত

দুই বন্ধু

কীভাবে বন্ধু হলেন **গুরু দত্ত** এবং **দেব আনন্দ**? একসঙ্গে দেখা স্বপ্ন কীভাবে সফল করলেন তাঁরা। বলিউডের ইতিহাসে এই অন্যতম হৃদয়গ্রাহী সম্পর্কের গল্প ফিরে দেখলেন **সিজার বাগচী**

গত শতাব্দীর চারের দশকের মাঝামাঝি। ভারত স্বাধীন হতে চলেছে। গোটা দেশ জুড়ে দমবন্ধ পরিস্থিতি। মহম্মদ আলি জিন্না ভারত ভাগ করে নতুন দেশ গড়ার ডাক দিয়েছেন। কী হবে বোঝা যাচ্ছে না। বাংলায় সদ্য মন্বন্তর হয়েছে। নানা জায়গায় দাঙ্গা। মারামারি। গান্ধীজি ছুটছেন এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায়। সুভাষচন্দ্র বসু নিরুদ্দেশ।
সেই পরিস্থিতিতে বম্বে মানে এখনকার মুম্বই গড়ে উঠছে নতুন করে। আগে বেশির ভাগ হিন্দি ছবি তৈরি হত কলকাতায়। সেই কলকাতা তখন অশান্ত। মুম্বই হয়ে দাঁড়িয়েছে হিন্দি ছবি তৈরির নতুন ঠিকানা। অনেক বাঙালি শিল্পী-পরিচালক-সঙ্গীত পরিচালক কলকাতা ছেড়ে পাড়ি দিতে শুরু করেছেন আরব সাগর উপকূলে। দেশের নানা প্রান্ত থেকে মানুষজন এসে উপস্থিত হচ্ছেন ওখানে। ঠিক তেমন ভাবে এসেছিলেন দুই তরুণ। গুরু দত্ত এবং দেব আনন্দ। প্রথমজনের বাড়ি কর্ণাটকে। দ্বিতীয়জনের পঞ্জাবের গুরদাসপুরে। এখন সেই জায়গা পাকিস্তানে। গুরু দত্ত এসেছিলেন পরিচালক হতে। দেব আনন্দ স্বপ্ন দেখতেন নায়ক হওয়ার। গুরু দত্ত শেষ পর্যন্ত প্রথম সারির পরিচালক হয়েছিলেন। ধাপে ধাপে প্রযোজক এবং নায়ক। দেব আনন্দ হয়ে উঠেছিলেন কিংবদন্তি নায়ক। সেখান থেকে প্রযোজক। পরে পরিচালক। স্বপ্নপূরণের প্রাথমিক পর্যায়ে বন্ধুত্ব হয়েছিল দু'জনের। যে বন্ধুত্ব দু'জনকে পেশাদার জীবনে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

প্রথম পরিচয়

১৯৪৬ সাল। পুণেতে 'হম এক হ্যায়' ছবির শুটিং চলছে। দেব আনন্দের প্রথম ছবি। যে গেস্ট হাউসে তাঁকে রাখা হয়েছিল, সেখানে আরও একজন অল্পবয়সি মহিলা ছিলেন। সুন্দরী। মহিলা একা থাকতেন। কিছুদিনের মধ্যে দেব আনন্দের সঙ্গে তাঁর শারীরী সম্পর্ক গড়ে উঠল। মহিলার প্রেমে পড়ে গেলেন অল্প বয়সি দেব। শুটিংয়ের ফাঁকে ফাঁকে ভুট্টা এবং আখের খেতে দু'জন লুকিয়ে দেখা করতেন।
একদিন সেই মহিলা বললেন, "কাল আমার জন্মদিন। তোমার সেরা জামা পরে আসবে। আমিও আমার সবচেয়ে পছন্দের শাড়ি পরে আসব।"
ঠিক হল সূর্যাস্তের সময় দু'জন দেখা করবে আখের খেতে। দেব তো উড়তে উড়তে রুমে ফিরলেন।
কিন্তু পরদিন আলমারি তন্ন তন্ন করে খুঁজেও সেরা জামাটা পাওয়া গেল না। তার বদলে অন্য জামা রাখা। পুণের শুটিংয়ে তাঁর দিদি সঙ্গে ছিলেন। দিদি একটা জামা বের করে বললেন, "এই তো তোর জামা।"
"এটা আমার জামা নয়," দেব জোর দিয়ে বললেন।
"ধোপা তো এটাই দিয়ে গেল!" দিদি বললেন, "এই একটা জামা কাচতে গিয়েছিল।"
দেব বুঝতে পারলেন, ধোপা অন্য কারও জামার সঙ্গে তাঁর জামা পালটাপালটি করে দিয়েছে। তখন আর কিছু করার নেই। ওই জামাটা পরেই শুটিংয়ে বেরোলেন।
দুপুর দুপুর স্টুডিয়োয় যেতে এক তরুণ টেকনিশিয়ানের মুখোমুখি। পাশ দিয়ে যেতে



■ শুরুর দিকে। তখন বন্ধুত্ব শুরু হয়েছে তাঁদের



■ দেব আনন্দ, দিলীপকুমার ও গুরু দত্ত

গিয়ে সেই লোক থমকে দাঁড়ালেন। বললেন, "তুমিই কি সেই নতুন নায়ক যার কথা সবাই বলাবলি করছে?"
"কী করে চিনলে?" আশ্চর্য হয়ে দেব প্রশ্ন করেছিলেন।
"তোমায় নায়কের মতোই দেখতে," লোকটা বললেন।
ভারী খুশি হলেন দেব আনন্দ।
লোকটা বললেন, "আমার নাম গুরু দত্ত। পরিচালক মিস্টার বেদেকরের সহকারী।"
"আশা করি আমাদের আবার দেখা হবে," হাত মিলিয়ে বললেন দেব।
"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই," বলে যেতে গিয়ে গুরু দাঁড়িয়ে পড়লেন। খুঁটিয়ে তাকালেন দেবের জামার দিকে। এ বার দেবের চোখ পড়ল গুরুর জামার দিকে। দেখলেন, গুরুর গায়ে তাঁর সেই শখের জামা।
গুরু প্রথম বললেন, "তোমার জামাটা তো বেশ ভাল।"
"তোমার জামাটাও।"
"কিনলে কোত্থেকে?"
"আগে তুমি বলো, কোত্থেকে কিনেছ?"
গুরু হেসে বললেন, "জামাটা এত সুন্দর! আমি ওটা চুরি করেছি।"
"আর এই জামা আমায় উপহার দিয়েছে ধোপা। একজনের জন্মদিনে পরার জন্য," দেব জবাব দিলেন।
দু'জনে প্রবল জোরে হেসে উঠলেন। পরস্পরকে জড়িয়ে ধরলেন। সেই থেকে শুরু হল দু'জনের বন্ধুত্ব।

অতঃপর...

'হম এক হ্যায়' ছবির শুটিংয়ে বন্ধুত্ব গাঢ় হল। দু'জনের মানসিকতার ভারী মিল। দু'জনেই চাইছিলেন বড় কোনও ছবি করতে। এমন ছবি যা সাড়া ফেলে দেবে। একজন হতে চাইছিলেন বড় পরিচালক। অন্য জন বড় স্টার। এক সঙ্গে বসে দু'জনে অনেক বিখ্যাত পরিচালকের ছবি দেখেছেন। পুণের রাস্তায় সাইকেলে চেপে ঘুরেছেন। সিনেমা সংক্রান্ত পত্রপত্রিকা কিনেছেন। সন্ধেবেলা বিভিন্ন রেস্তরাঁয় বসে আড্ডা দিয়েছেন। টাঙায় চেপে শহরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে গিয়েছেন। সেখানকার টিলার মাথায় চড়ে লম্বা লম্বা ঘাস এবং বুনো ফুলের মাঝখানে বসে গল্প করতে করতে দেখেছেন সূর্য ডুবে যাচ্ছে পশ্চিমে। লাল আকাশের দিকে তাকিয়ে দুই বন্ধুর মনে হয়েছিল, একদিন আকাশের ওই লাল রঙের মতো তাঁরা ছড়িয়ে পড়বে চলচ্চিত্র জগতে। যখন সবাই তাঁদের নাম জানবে। তাঁরা এমন ছবি করবে যা থেকে যাবে ইতিহাসের পাতায়।
মুম্বইয়ে এসে গুরু দত্ত ক্যামেরা নিয়ে পালি হিলে ছবি তুলতে যেতেন। সেই সব ছবির মডেল ছিলেন দেব আনন্দ। কখনও বাসে চেপে তাঁরা চলে যেতেন গুরুর বাড়ি মাটুঙ্গায়। তেমনই একদিন বিয়ার খেতে খেতে গুরু নিজের গ্লাস নিয়ে দেবের গ্লাস ঠুকে বলেছিলেন, "আমি পরিচালক হলে তুমি হবে ছবির নায়ক।"
দেবও নিজের গ্লাস গুরুর গ্লাসে ঠেকিয়ে জবাব দিয়েছিলেন, "আমি প্রযোজক হলে তুমি হবে সেই ছবির পরিচালক।"
আর একদিন দু'জনে ট্রেনে করে যাচ্ছিলেন। এমন সময় এক রেল স্টেশনে গুরুর চোখে পড়ল 'হম এক হ্যায়'-এর পোস্টার। তিনি চিৎকার করে বলে ওঠেন, "ওই দ্যাখো তোমার ছবি।"

দেব উঁকি মেরে দেখতে দেখতে ট্রেন প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে চলে যায়। ভারী আফশোস হল তাঁর। পঞ্জাবে থাকতে অশোককুমারের এমন ছবির পোস্টারে দেখেছেন। এ বার তাঁর ছবি টাঙানো রেলের প্ল্যাটফর্মে! বাধ্য হয়ে তিনি বললেন, "তোমার হয়তো বোরিং লাগবে। কিন্তু আমি ফেরত যেতে চাইছি। রেল স্টেশনে আমার ছবি দেখতে।"
গুরু তৎক্ষণাৎ রাজি। দু'জনে ওই ট্রেনে বসে থাকেন। ট্রেন শেষ স্টেশনে গিয়ে খানিক বাদে ফেরত আসে সেই স্টেশনে যেখানে 'হম এক হ্যায়'-এর পোস্টার লাগানো। দেব অবাক চোখে নিজের ছবির দিকে তাকিয়েছিলেন। ওখানে তখন কয়েকজন অল্পবয়সি মেয়েও পোস্টার দেখতে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। গুরু এগিয়ে গিয়ে তাদের প্রশ্ন করলেন, "কেমন লাগছে নতুন নায়ককে?"



দেবের সঙ্গে শুটিংয়ে ওয়াহিদা। দেখছেন গুরু



দেব, ওয়াহিদা, গুরু একসঙ্গে

দেব আনন্দের তখন মনে পড়েছিল গুরু দত্তকে। একদিন বিয়ারের গ্লাস ঠুকে তিনি কথা দিয়েছিলেন, প্রযোজক হলে গুরুকে পরিচালনার সুযোগ দেবেন। অতএব তিনি ডেকে...

"খুব ভাল," একটি মেয়ে বলল।
"নায়কের সঙ্গে আলাপ করবে?"
"হ্যাঁ," মেয়েগুলো উৎসাহ নিয়ে বলল।
"তা হলে গিয়ে ছবিটা দেখো," পাশ থেকে দেব আনন্দ বলে উঠলেন।
মেয়েগুলো একবার দেব আনন্দকে দেখল। আবার পোস্টারের দিকে তাকাল। তারপর পরস্পরের দিকে তাকিয়ে লজ্জা-লজ্জা মুখ করে হাসল।
দুই বন্ধু ততক্ষণে হাত ধরাধরি করে পরের ট্রেন ধরার জন্য ছুটল।

বাজ়ি, জাল এবং...

দাদা চেতন আনন্দের ছবির প্রযোজক হওয়ার জন্য দেব আনন্দ নতুন প্রোডাকশন হাউস খুলেছিলেন। নবকেতন। সেই প্রোডাকশন হাউসের প্রথম ছবি 'অফসর'। অভিনয় করেছিলেন দেব আনন্দ এবং সুরাইয়া। তখন সুরাইয়া বিরাট স্টার। এবং দেব-সুরাইয়ার প্রেম নিয়ে সারা ভারত উত্তাল। ওই ছবি থেকে শচীন দেববর্মণের সঙ্গে নবকেতন কাজ করা শুরু করেছিলেন। তবু 'অফসর' বিশেষ চলেনি।
দেব আনন্দের তখন মনে পড়েছিল গুরু দত্তকে। একদিন বিয়ারের গ্লাস ঠুকে তিনি কথা দিয়েছিলেন, প্রযোজক হলে গুরুকে পরিচালনার সুযোগ দেবেন। অতএব তিনি ডেকে পাঠালেন গুরুকে।
গুরু দত্ত এসে বসে সিগারেট জ্বালতে যাবেন। দেব বললেন, "মনে আছে, পুণের পাহাড়ে বসে আমরা স্বপ্ন দেখেছিলাম? এবার সেই স্বপ্ন সত্যি হোক। তুমি নবকেতনের পরের ছবি পরিচালনা করবে।"
শুরু হল সেই ছবির প্রস্তুতি। ততদিনে সুরাইয়ার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছে দেবের। এমন সময় চেতন আনন্দ একজনের সঙ্গে পরিচয় করালেন। মেয়েটির নাম মোনা সিংহ। সিমলা থেকে মুম্বই এসেছেন। নতুন ছবি, যার নাম 'বাজ়ি', সেই ছবির দ্বিতীয় নায়িকা হিসেবে মোনাকে ভাবা হয়েছে। তবে মোনা সিংহের বদলে তাঁর নতুন নামকরণ করেছেন চেতন। কল্পনা কার্তিক। সেই মোনা সিংহকে পরবর্তীকালে বিয়ে করেছিলেন দেব আনন্দ।
'বাজ়ি' ছবিটি অনেক দিক থেকে দুই বন্ধুর জন্য গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, দেব আনন্দ কথা রেখেছিলেন। দ্বিতীয়ত, পরিচালক গুরু দত্তের প্রথম ছবি 'বাজ়ি'। তার আগে অমিয় চক্রবর্তী এবং জ্ঞান মুখোপাধ্যায়ের মতো পরিচালকের সহকারীর কাজ করছিলেন। তৃতীয়ত, দেব



■ শুটিং ফ্লোরে প্যাক আপের পর এভাবেই আড্ডায় মেতে উঠতেন সকলে। তেমনই এক আড্ডার ফাঁকে তোলা ছবি। রয়েছেন দেব আনন্দ, গুরু, শচীনদেব সহ অনেকে

আনন্দের যে ইমেজ, যা দেখে তখনকার মেয়েরা ফিদা হয়ে গিয়েছিল, সেটা অনেকটাই গুরু দত্তের হাতে তৈরি। পরে বিজয় আনন্দ সেই ইমেজকে ঘষামাজা করে আরও ঝকঝকে করে তুলেছিলেন। প্রাথমিক আদল গুরু দত্তের দেওয়া। 'বাজ়ি' থেকে দেব আনন্দের সংলাপ বলার স্টাইল, সিগারেট ধরানোর কায়দা, টুপি— সব এল। ওই ছবি দেব আনন্দকে স্টার করে তুলেছিল। ছবির প্রিমিয়ারের পর মেয়েরা তাঁকে ঘিরে ধরেছিল। আর গুরু দত্ত? রাতারাতি তিনি হয়ে উঠেছিলেন প্রথম সারির পরিচালক।
হলিউডের ছবি 'গ্লাইডা' থেকে তিনি তৈরি করেছিলেন 'বাজ়ি'। হিন্দি ছবির প্রথম 'নয়ার ফিল্ম'। প্রথম ছবির পরিচালক হিসেবে গুরু বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি লম্বা রেসের ঘোড়া। 'বাজ়ি' দুই বন্ধুকে সাফল্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তবে সেখানেই শেষ নয়। ছবি মুক্তি পাওয়ার পর দু'জনে গিয়েছিল এক বিদেশি ছবি দেখতে। 'বিটার রাইস'। দেখার পর গুরু দত্ত ঘোষণা করেছিলেন, "পরের ছবি এটা নিয়ে করব।"
দেব আনন্দও এক পায়ে খাড়া। সেই ছবি 'জাল'। মহারাষ্ট্র এবং গোয়ার সীমান্তের ছবির মতো গ্রাম মালওয়ান। সেখানে হয়েছিল 'জাল'-এর শুটিং। শুটিংয়ের সময় এক বিপর্যয় এসে পড়েছিল।
ছবিতে গীতা বালির দৃষ্টিহীন দাদার ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন কে এন সিংহ। হিন্দি ছবির জগতে তাঁকে সবাই 'আঙ্কল' বলে ডাকতেন। একদিন সমুদ্রের ধারে শুটিং হচ্ছে। দূরে এক কুঁড়ে ঘর থেকে আঙ্কল ইশারায় ডাকলেন দেবকে। গীতা বালির শট চলছিল। পরিচালকের অনুমতি নিয়ে দেব গেলেন সেখানে।
কে এন সিংহ তখন নেশা করে অল্প দুলছেন। সামনে রাখা বোতল।
দেব জানতে চান, "কী খাচ্ছেন এটা?"
"ফেনি। হুইস্কির চেয়ে ঢের ভাল। একটু চেখে দেখো।"
"আমি মদ খাই না," দেব পিছিয়ে গেলেন।
"এটা ঠিক মদ নয়। অল্প খাও। দেখবে ক্যামেরার সামনে মুড এসে যাবে।"
ইতস্তত করে দেব বললেন, "বেশ। অল্পই দেবেন কিন্তু।"
কে এন সিংহ এক গ্লাস ভর্তি ফেনি রাখলেন দেবের সামনে। বললেন, "তোমাদের অল্প বয়স। ঢক করে খেয়ে নাও। চিন্তা কোরো না, ওইটুকুতে কিছু হবে না। তুমি তো আর গোটা বোতল খাচ্ছ না হে।"
এর পর নিজে এক গ্লাস ঢক ঢক করে খেয়ে ফেললেন। দেখাদেখি দেবও এক নিঃশ্বাসে পুরো গ্লাস গলায় ঢাললেন।
এই সব যখন চলছে, তখন গুরু দত্তের সহকারী এসে জানালেন, "দেবজি, জোয়ারের জল বাড়ছে। তাড়াতাড়ি শুটিং শেষ করে নিতে হবে।"
দেব উঠে পড়লেন। শুটিং স্পটে যেতে গুরু বললেন, " রিহার্সাল দেওয়ার সময় নেই। জল বাড়ছে। গীতার হাত ধরে ছুটে গোড়ালি ডোবানো জলে যাবে। তারপর ঘুরে তাকাবে ক্যামেরার দিকে। আমি তখন 'কাট' বলব।"
সহজ শট। দেব আর গীতা হাত ধরাধরি করে ছুটলেন সমুদ্রের দিকে। কিছুদূর যাওয়ার পর পিছন থেকে গুরু হেঁকে বললেন, "ব্যস, আর যেতে হবে না।"
দেব তখনও গীতার হাত ধরে আরও গভীর জলের দিকে এগিয়ে চলেছেন।
গুরু ফের চিৎকার করলেন, "শুনতে পাচ্ছ? আর যেতে হবে না..."
কিন্তু দু'জনকে তখন থামায় কে! বিশেষ করে দেব। গুরু ততক্ষণে বুঝেছেন কোনও গন্ডগোল হয়েছে। তাই ক্যামেরা ছেড়ে এবার তিনিও ছুটতে শুরু করেছেন নায়ক-নায়িকার দিকে। প্রাণপণে।
ওদিকে দেব-গীতা যখন আরও জলে গিয়ে পড়েছেন, তখন আচমকা চোরা কারেন্টের ধাক্কায় দু'জনের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেল। দেব দেখলেন গীতার নাকে-মুখে জল ঢুকে গিয়েছে। এবং দু'জন ভেসে চলেছে গভীর সমুদ্রের দিকে। হাত-পা ছুড়েও কিছু

করা যাচ্ছে না। কপাল ভাল, ঠিক তখনই আর একটা ঢেউ এল। সেই ঢেউ দু'জনকে এনে ফেলল বালিয়াড়িতে। গুরু দত্ত এবং বাকি ইউনিট মেম্বারদের সামনে। ফেনির নেশায় দেব তখনও হো হো করে হাসছেন। যদিও নোনা জল ঢুকে তাঁর দামি রোলেক্স ঘড়ি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। একটু পরে নেশার ঘোর কাটতে লাগল। দেবের মাথা তখন টলমলে। গুরু দত্ত বাধ্য হয়ে বললেন, "প্যাক আপ।" পুরোপুরি সুস্থ হতে দেবের আরও সময় লেগেছিল। সন্ধে-রাতে গুরু এবং গীতার সঙ্গে তিনি স্থানীয় গ্রামে নাটক দেখতে যান। সেই নাটক দেখে ফিরতে ফিরতে রাত দুটো। তখনও কি দুই বন্ধু জানতেন, এটাই শেষ ছবি? আর কখনও কোনও ছবি তাঁদের একসঙ্গে করা হবে না!

শেষ পর্যন্ত

১৯৬৪ সাল। দেব আনন্দ তখন প্রতিষ্ঠিত নায়ক। প্রযোজক। ধাপে ধাপে পরিচালক হচ্ছেন। সেই উদ্দেশ্যে 'তিন দেবিয়া' ছবি করছেন। ছবির পরিচালকের নাম অমরজিৎ হলেও ছবির কাহিনি এবং পরিচালনায় তিনি নিজে। নায়কের ভূমিকাতেও। ছবিতে তিনজন নায়িকা। সেই ছবির শুটিং চলার সময় প্রথম খবর এল, পাকিস্তানের গুরদাসপুরে তাঁর বাবার মৃত্যু হয়েছে।
সেই ধাক্কা সামলে ফের কাজে মন দিয়েছেন, এমন সময় ছবির ফ্লোরে একজন এসে কানে কানে বলল, "গুরু দত্ত মারা গিয়েছেন।" এক মুহূর্ত। আলো ঝলমলে স্টুডিয়ো ফ্লোরে দাঁড়িয়ে দেব আনন্দের মনে হয়েছিল, চারপাশে নিকষ অন্ধকার। সবাই তখন প্রস্তুত। এ বার শট শুরু হবে। দেব আনন্দ শুধু বলবেন, 'অ্যাকশন।'
তার বদলে তিনি চিৎকার করে বলেছিলেন, "প্যাক আপ।"
গোটা ফ্লোর চমকে উঠল। হতবাকও। সবার দিকে তাকিয়ে দেব আনন্দ ভাঙা গলায় বলতে পেরেছিলেন, "গুরু মারা গিয়েছে।" ফ্লোর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন দেব। দিন কয়েক আগের স্মৃতি তখন তাঁর মাথায় ঘুরছে। গুরুর বাড়ি গিয়েছিলেন। অনেক বছর বাদে দু'জনে ফের মুখোমুখি। দেবের মনে হয়েছিল, গুরুর চেহারা অনেক ফ্যাকাশে। চুল পড়ে গিয়েছে। সিগারেট ধরিয়ে কথা বলার সময় বোঝা গেল, গলার স্বরও দুর্বল। গুরু বলছিলেন, "দেব, চলো আর একটা ছবি করি আমরা। একসঙ্গে।"
"হ্যাঁ নিশ্চয়ই। স্ক্রিপ্ট রেডি করো। তুমি তো



দেব আনন্দকে স্টাইল আইকন হিসেবে তুলে ধরার পিছনে গুরুর অবদান অনস্বীকার্য

> সেই ধাক্কা সামলে ফের কাজে মন দিয়েছেন, এমন সময় ছবির ফ্লোরে একজন এসে কানে কানে বলল, "গুরু দত্ত মারা গিয়েছেন।" এক মুহূর্ত। আলো ঝলমলে ফ্লোরে দাঁড়িয়ে দেব আনন্দের...

জানো, আমি সব সময় তোমার সঙ্গে আছি," দেব জবাব দিয়েছিলেন।
সেই মানুষটা আর নেই! দেবের তখনও বিশ্বাস হচ্ছিল না। স্টুডিয়ো থেকে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে দেব সোজা গিয়ে হাজির হয়েছিলেন গুরু দত্তের বাড়িতে। তখনও বাকিরা কেউ খবর পেয়ে আসেননি। শোওয়ার ঘরে গুরু দত্তের মৃত শরীর বিছানায় পড়ে। দেব গিয়ে সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। ফাঁকা ঘরে দু'জনে। আবার। এ বার পরিস্থিতি আলাদা। গুরুর মুখ নীলচে। বোধ হয় যে রঙিন তরল গ্লাসে রাখা ছিল বিছানার পাশে, তার জেরে। সেই তরল খেয়েই গুরু আত্মহত্যা করেছিলেন।
গুরু দত্তের মুখের অভিব্যক্তি দেখে দেব আনন্দের মনে হয়েছিল, তিনি যেন বলছেন, "চলি বন্ধু। তোমাকে মিস করছিলাম। এবার আমায় যেতে হবে। তবে তুমি থেমো না। এগিয়ে যাও।"
কিছুক্ষণ ওখানে থাকার পর পায়ে পায়ে বেরিয়ে এসেছিলেন দেব আনন্দ। গাড়ি চালিয়ে যখন ফিরছেন, তখন তাঁর চোখের সামনে ভাসছে পুণের সেই পাহাড় চূড়ার মুহূর্ত। যখন সূর্যাস্তের আলোয় দুই বন্ধু স্বপ্ন বুনছেন... একদিন তাঁদের নামও...

পুনশ্চ

গুরু দত্তকে চলচ্চিত্র জগতের সবচেয়ে কাছের বন্ধু বলেছেন দেব আনন্দ। দীর্ঘদিনের বন্ধু হলেও স্রেফ দুটো ছবি করেছেন দু'জনে। যেখানে দেব নায়ক। গুরু পরিচালক। তবু এত বছর উজিয়ে এসেও সেই দুটো ছবি ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে জায়গা করে নিয়েছে। যেমন তাঁরা চেয়েছিলেন। এখনও গুরু দত্তের শতবর্ষে দাঁড়িয়ে 'বাজ়ি' এবং 'জাল'কে উপেক্ষা করার উপায় নেই। শুধু গুরু দত্তের প্রথম এবং দ্বিতীয় ছবি কিংবা দু'জনের বন্ধুত্বের নিদর্শন নয়। ওই দুটো ছবি ভারতীয় চলচ্চিত্রকে অনেক আধুনিক করে তুলেছিল। দেব আনন্দকে করে তুলেছিল স্টার। এবং গুরু দত্তকে ভরসা জুগিয়েছিল। এই বন্ধুত্ব এবং ওই দুই চলচ্চিত্র না থাকলে পরবর্তীকালে 'পিয়াসা' কিংবা 'কাগজ় কা ফুল'-এর গুরু দত্তকে কখনও পাওয়া যেত কিনা সন্দেহ।



প্রিয় গুরুজি

তাঁর হাত ধরেই বলিউডে প্রথম সুযোগ পাওয়া। তিনিই ছিলেন তাঁর মেন্টর কাম গাইড। গুরু দত্তের মৃত্যুর শতবর্ষ উপলক্ষ্যে গুরু দত্তের স্মৃতিচারণায়

ওয়াহিদা রেহমান

গুরুজির সঙ্গে কাজই হত না যদি না একটা মহিষ আমাদের সাহায্য করত! হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন, একটা মহিষ। তখন গুরুজি হায়দরাবাদে একটা কাজে এসেছেন। ১৯৫৫ সাল। আমি নৃত্যশিল্পী হিসেবে টুকটাক নাম করেছি। তেলুগু ছবি ‘রোজুলু মারাই’-তে আমার নাচ বেশ জনপ্রিয় হয়। আর গুরুজি হায়দরাবাদে এসেছিলেন জনপ্রিয় তামিল ছবি ‘মিসিয়াম্মা’ হিন্দিতে পুনর্নির্মাণ করবেন বলে। হায়দরাবাদে গুরুজিদের গাড়ির সামনে হঠাৎ একটি মহিষ এসে পড়ে এবং সেই সংঘর্ষে গুরুজির গাড়ি বিগড়ে যায়। সামনের দিকটা পুরোটা ভেঙে গিয়েছিল। গাড়ি ঠিক না হলে তো যেতে পারবেন না, তাই হায়দরাবাদে আরও তিনদিন গুরুজিকে থাকতে হয়। যেহেতু হাতে সময় ছিল তাই গুরুজি হায়দরাবাদের এক বড় পরিবেশকের অফিসে যান এবং সেখানেই ওঁর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা। ওঁর আমাকে দেখে ভাল লাগে এবং সেই পরিবেশকের কাছে আমার সম্পর্কে জেনে উনি ওঁর মাধ্যমেই আমার সঙ্গে আলাপ করেন। মনে আছে, আমি সেদিন খুব সাধারণ পোশাক পরেছিলাম, এমনকি ঠোঁটে লিপস্টিকও ছিল না। বিশ্বাস করুন, গুরুজির সঙ্গে যখন প্রথম আলাপ হল, ওঁকে দেখে একবারও মনে হয়নি যে উনি একজন বিখ্যাত পরিচালক। এত আস্তে কথা বলতেন যে ঠিকমতো শোনাই যাচ্ছিল না! প্রথম আলাপে গুরুজি এটাই জানার চেষ্টা করছিলেন, আমি উর্দুতে কতটা স্বচ্ছল। প্রায় আধঘণ্টা আমাদের মধ্যে কথাবার্তা হয়। আমিও সেই সময় হায়দরাবাদে ছিলাম ওই ছবির কাজে, তারপর মাদ্রাজে আমার বাড়িতে ফিরে আসি। সত্যি বলতে গুরুজির সঙ্গে সাক্ষাতের ঘটনাটাও ভুলে গিয়েছিলাম। ওঁর কোনও প্রভাব আমার উপর পড়েনি। কিন্তু আমি বুঝতেই পারিনি যে প্রথম থেকেই গুরুজি আমাকে ওঁর ছবি ‘সিআইডি’র জন্য ভাবছিলেন। ছবিতে শাকিলাকে নায়িকার চরিত্রে ভেবেছিলেন এবং ভ্যাম্পের চরিত্রটির জন্য আমার কথা ওঁর মনে হয়েছিল। ওঁর সঙ্গে হায়দরাবাদে আলাপের প্রায় তিন মাস পরে বম্বেতে আমার ডাক পড়ে। সেই ডাক পেয়ে স্বভাবতই আমি খুব খুশি হয়েছিলাম কারণ আর পাঁচজনের মতো আমারও স্বপ্ন ছিল বলিউডে কাজ করার। ১৯৫৫ সালের জুন মাস, বম্বেতে সিনে বিল্ডিংয়ে গুরুজির অফিসে যাই ওঁর সঙ্গে দেখা করতে। আমার একটা স্ক্রিন টেস্ট হয় এবং সেখানে আমাকে পছন্দ হওয়ার পর গুরুজি আমার সঙ্গে তিন বছরের চুক্তি করেন। প্রথম বছরের জন্য আমাকে ১২০০ টাকা দেওয়া হয়। মনে আছে, চুক্তিটা হওয়ার পর গুরুজি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন আমি খুশি কি না। আমি বলেছিলাম সিনেমার ক্ষেত্রে আমার একটা চিন্তা হল কস্টিউম। আমি সবধরনের পোশাকে কমফর্টেবল ছিলাম না। উনি আশ্বস্ত করেন যে, এই ক্ষেত্রে আমার কোনও সমস্যা হবে না। প্রথমে ‘সিআইডি’র শুট শুরু হয়, নায়ক ছিলেন দেব আনন্দ। একদিন শুটে আমার জন্য যে কস্টিউম আনা হয়, সেটা আমার বেশি রিভিলিং মনে হয়েছিল। আমি ড্রেসম্যানকে বলি আমি ওই পোশাক পরব না। সেই সময় ফ্লোরে গুরুজি ছিলেন না। বাকিরা সকলেই আমাকে বোঝাতে থাকেন যে, এটা আমার প্রথম ছবি। একরকম ঝামেলা করলে আমাকে কোনও প্রযোজক নেবেন না। আমিও বলে দিই দরকার নেই আমার কাজের, আগে আমার কমফর্ট তারপর কাজ। কিছুক্ষণ পর গুরুজি আসেন এবং ওঁকে আমি স্পষ্ট বলে দিই এরকম পোশাক আমি পরব না। উনি কিন্তু একটা বাক্যও না বলে ড্রেসম্যানকে নির্দেশ

দেন পোশাক বদলে দিতে। এই ছবির শুটের মাঝেই গুরুজি 'পিয়াসা'র কাজ শুরু করে দেন। যেখানে আমাকে এক যৌনকর্মীর চরিত্র দেওয়া হয়। এটা আমার কাছে একটা বিশাল বড় চ্যালেঞ্জ ছিল কারণ অভিনয়ে আমি নতুন ছিলাম। কিছু অভিব্যক্তি সম্পর্কে জানতাম কারণ আমি নৃত্যশিল্পী ছিলাম। তবে পুরো ক্রেডিট ওয়েন্ট টু গুরুজি। উনি আমার পিছনে যেভাবে খেটেছিলেন সেটা সত্যিই ভোলার নয়। উনি না থাকলে ওই চরিত্রটা আমি করতেই পারতাম না। এরপর 'চওধভিন কা চাঁদ', 'কালা বাজ়ার', সহ একাধিক ছবিতে আমরা একসঙ্গে কাজ করি। যেহেতু গুরুজি খুব কম কথা বলতেন, তাই ওঁকে অনেকেই ভুল বুঝতেন। উনি কোনও প্রতিবাদও করতেন না। ভীষণ সেনসেটিভ ছিলেন, অল্পতেই দুঃখ পেতেন। আমার উপর কখনও চিৎকার করেননি কিন্তু সেটে অনেক সিনিয়র



গুরু দত্ত ছিলেন ওয়াহিদার মেন্টর

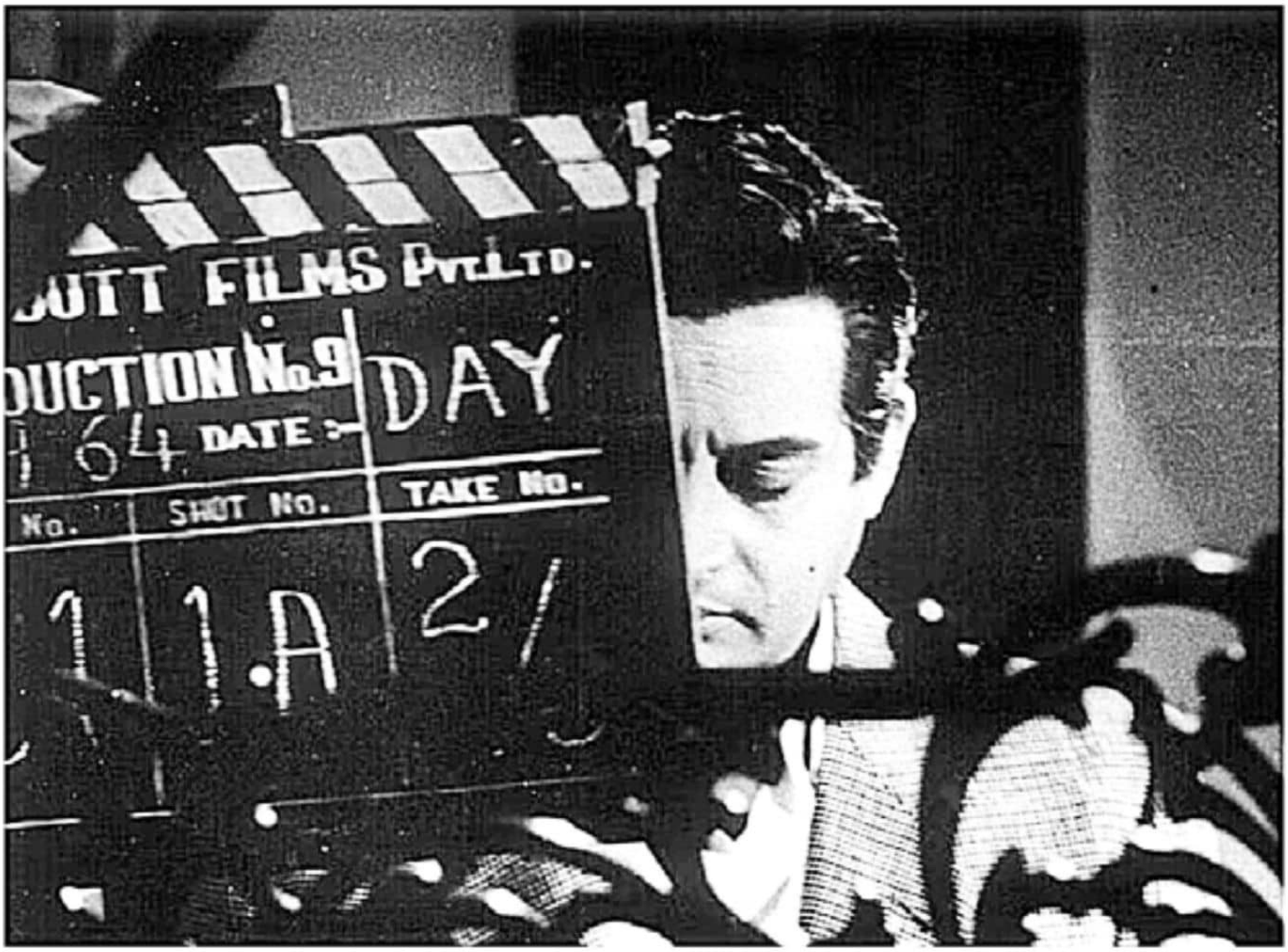


'পিয়াসা' ছবির সেটে ওয়াহিদাকে সাজিয়ে দিচ্ছেন গুরু দত্ত *ধূমপান স্বাস্থের পক্ষে ক্ষতিকর

> গুরুজি আমার উপর কখনও চিৎকার করেননি কিন্তু সেটে অনেককেই বকাবকি করতেন

অভিনেতাকে বকাবকি করতে আমি শুনেছি। 'পিয়াসা'র একটি দৃশ্য ছিল যেখানে আমি সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে একটা সংলাপ বলব। কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসতে-আসতে আমি যেহেতু ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলাম তাই তারপরে সংলাপটা আর ঠিক করে বলতে পারছিলাম না। মোট ৩০-টা রিটেক দেওয়ার পরেও শট ওকে হয়নি। গুরুজির নির্দেশে আমরা লাঞ্চ ব্রেক নিই। লাঞ্চের পর আরও ১৪ টা শট অর্থাৎ সবমিলিয়ে ৪৪ টা রিটেকের পর শট ওকে হয়। গুরুজি কিন্তু আমার উপর এতটুকুও রেগে যাননি। আর নিজে যা সিদ্ধান্ত নিতেন, তাই নিয়ে ভীষণ কনফিডেন্ট থাকতেন। 'সিআইডি' বা 'পিয়াসা'র শুটের প্রথমদিনগুলোতে আমার অভিনয় বেশ দুর্বল ছিল। অনেকেই গুরুজিকে বলেছিলেন যে আই ওয়াজ় রং চয়েস। কিন্তু গুরুজি আমার উপর বিশ্বাস হারাননি। 'পিয়াসা'র প্রায় ২০ দিনের শুট আমরা কলকাতায় করেছিলাম। তখন শুটের পর উনি আমাকে কলকাতায় ঘুরিয়েছিলেন, ভাল-ভাল খাবার খাইয়েছিলেন। গুরুজির সঙ্গে প্রচুর ভাল স্মৃতি রয়েছে। উনি সর্বদা আমার মনের একটা বিশেষ জায়গায় থাকবেন।

অনুলিখন : আসিফ সালাম



অশ্রুর অধিকার এবং গুরু দত্ত

'পিয়াসা' থেকে 'সাহেব বিবি অউর গুলাম', কীভাবে নিজের ব্যক্তিগত জীবন, অবদমিত যৌন আকাঙ্ক্ষা ও ভীতিকে সিনেমার পর্দায় ধরেছেন **গুরু দত্ত**? বিশ্লেষণ করলেন **সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়**

'সাহেব বিবি অউর গুলাম'-এর অন্তিম অধ্যায় নিয়ে যখনই ভাবি, তখনই দেখি, খুঁড়ে রাখা জমি, অলঙ্কার ভূষিতা কঙ্কালের হাত, সায়াহ্নের মেঘমেদুর আকাশ, প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ, ভঙ্গুর প্রাচীর, বিশাল কড়িবরগা ভূপতিত হওয়ার পরে ধুলোর আবরণে আবৃত। আমার দেখে মনে হয়, এ সমস্তই গুরু দত্তর আত্মপ্রতিকৃতি। গুরু দত্ত চলচ্চিত্রকার হিসেবেই প্রসিদ্ধ। কিন্তু আমার কেন জানি না মনে হয়, তাঁর হয়তো কবি হওয়াই সঙ্গত ও সমীচীন হত। যে মমতায় তিনি তাঁর নারীদের দেখেছেন, তাঁর সমসাময়িক ইতিহাসকে দেখেছেন এবং ক্রমশ এগিয়ে গিয়েছেন শেষ প্রহরের দিকে, তা কবিদের জন্মগত অধিকার। এই যে একবার সুন্দরের পানে চেয়ে, আর একবার বেদনার পানে, তিনি তাঁর 'গুলাব'কে সৃষ্টি করলেন 'পিয়াসা'য় বা ছোট বহুকে 'সাহেব বিবি অউর গুলাম'-এ। আমরা খেয়াল করি যে, এই চরিত্রদ্বয়ের দু'টি দৃষ্টিকোণ। যখনই আমরা মীনাকুমারীর ক্লোজ় আপ দেখি বা গুলাবকে প্রিন্সেপ ঘাটে দেখি, তখনই আমাদের মনে হয়, কবিতা তো রতির অন্য নাম। মাংস লাবণ্যের দাহ্য সুখ। আর এই কথাটার সঙ্গে মনস্তত্বের যোগাযোগও আছে। ত্রিশ দশকে ফ্রয়েড তাঁর একটি বক্তৃতায় বলেছিলেন, জীবিত মানুষ তাঁর যৌন আকাঙ্ক্ষার দ্বারা একে অপরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জৈবিক প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করে। আর তার মৃত্যুকামনা জীবনকে ব্যর্থ করে আবার জড়পদার্থে পরিণত করতে চায়। গুরু দত্ত এই সমস্যার নিরসন করতে পারেননি। ওয়াহিদা রেহমানের একান্ত অনুরোধ সত্ত্বেও পারেননি।

আসলে তিনি যতটা হিন্দি সিনেমার পরিচালক ও

অভিনেতা, তার চেয়েও অনেক বড় হয়ে দেখা দেন একজন বিয়োগান্তক তারকা হিসেবে। এডগার মঁর্যা, একজন ফরাসি সমাজতাত্ত্বিক, এই নক্ষত্র সম্পর্কিত ধারণার বিষয়ে বলেছিলেন, 'তিনি আসলে স-জীবনী অভিনেতা।' গুরু দত্ত তাঁর চলচ্চিত্রে যতটা বিধৃত রয়েছেন, তার চেয়ে অনেক বেশি কৌতূহল তাঁর সম্পর্কে তৈরি হয় একটি ত্রিকোণ প্রেমের দ্বন্দ্বে। এই দ্বন্দ্ব তো আজীবনের। আর গুরুর জীবনের দিকে যদি তাকাই, তা হলে বাঙালিদের তো তাঁর প্রতি আকর্ষিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে! কারণ বাঙালিদের যে রোম্যান্টিকতা, তা গুরুর প্রাণশক্তি। তিনি উদয়শঙ্করের মতো বিরাট

পরিত্যক্ত অংশের অধিবাসিনী। এই যে চ্যুতি, তা গুরু দত্তকে ভারতীয় চলচ্চিত্রে বাকিদের চেয়ে আলাদা করে দেয়। বস্তুত ভারতীয় মেলোড্রামার ইতিহাসে ঋত্বিক ঘটক যেমন দেশের বিভাজন রেখাটিকে বিপুল গুরুত্বের সঙ্গে সঞ্জীবিত করেছেন, তেমন গুরু এক আত্মহননকামিতাকে সম্মুখবর্তী করেছেন। তাই তাঁকে সামান্য চলচ্চিত্রকার হিসেবে বর্ণনা করলে চলবে না।

আমাদের দেবতারা যে সবাই স্বর্গের অধিবাসী, তা তো নয়, অনেকে মর্তের গলি উপগলিতে ছদ্মবেশে লুকিয়ে থাকেন জনপ্রিয়তার আড়ালে! গুরু দত্ত জানতেন, অন্যান্য শিল্প মাধ্যমে অন্তত আপেক্ষিক স্বাধীনতা

পড়ল স্বর্গের বাগানে। প্যারিস স্প্লিন-এর সেই বিখ্যাত গদ্য কবিতা, কবি যেখানে নিজের মহিমা হারিয়ে অশনাক্ত রাজকুমার, গুরু দত্তের সত্তা তেমন শিরোভূষণহীন, 'পিয়াসা'র বিজয়। পিয়াসা কখনওই শিল্পের শিখর ছুঁতে পারেনি। তবে শিল্পের সম্ভ্রম যে কবিকে ক্লান্ত করে, তা বুঝিয়ে দিয়েছে সভ্যতার রুগ্ন বিকেলে। আমাদের জনপ্রিয় ছবির জগতে 'পিয়াসা'র মতো কনে দেখা আলো, এমন রোম্যান্টিক স্টেটমেন্ট আর নেই।

এক একটি নারী যেন ঈশ্বরীর মতো! সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে থাকেন ওয়াহিদা রেহমান, যেন নরকের সুরবিস্তার। গুরু দত্ত চলকে ওঠা আলোর টুকরোয় তাঁর গুলাবকে দেখলেন জীবনের পানপাত্রে। বাসনার বহ্নিশিখায় যেন এক অলৌকিক দৃষ্টিপাত, যা সহসা অন্তর্হিত হল, আবার অমরত্ব পরমুহূর্তেই যাকে ফিরিয়ে দিল সময়ের বেলাভূমিতে। 'আজ সজনমোহে অঙ্গ লাগালো' গানটিতে গুলাব তার মৃত্যুকে বা জীবনাধিক জীবনকে লুকিয়ে রাখে চোখের পল্লবে। মুখের রেখায় জমে থাকে শ্রাবস্তীর কারুকার্য।

ক্রেনশটে অন্তিম দৃশ্যের ঠিক আগের দৃশ্য: কামনার দগ্ধাবশেষ নারীকে স্পর্শ করতে চায়। কিন্তু সে বোঝে কবি তার কাছে কত দূর! দেহের উৎসব শেষে ইতিহাস



কী ছিল গুরু দত্তর উদ্দেশে ওয়াহিদার একান্ত অনুরোধ?

নর্তকের কাছে আদি পাঠ নিয়েছিলেন। তাঁকে আশীর্বাদ করেছিলেন স্বয়ং উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ। এবং গুরুর ছবিতে যিনি বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছেন, তিনি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস' উপন্যাসটিকে তিনি কখনওই ভুলতে পারেননি। 'কাগজ কে ফুল' ছবিতে প্রধান চরিত্র, চলচ্চিত্র পরিচালক সুরেশ সিনহা 'দেবদাস' অবলম্বনেই ছবি বানাচ্ছেন! আর সমগ্র পিয়াসা দেবদাসেরই এক ধরনের কাব্য রূপ, তাহলে আমরা কী করে গুরু দত্তকে বিশ্লেষণ করব? আসলে গুরু এমন একজন রোম্যান্টিক, যিনি কবিকে বা শিল্পীকে সমাজ পরিত্যক্ত ভাবেন! ভাবেন, একজন প্রান্তিক অধিবাসী হিসেবে। তাঁর নায়িকারা, ওয়াহিদা রেহমান, মীনাকুমারীরাও সমাজের

শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস' উপন্যাসটিকে গুরু কখনওই ভুলতে পারেননি। 'কাগজ় কে ফুল' ছবির প্রধান চরিত্র সুরেশ 'দেবদাস' অবলম্বনেই ছবি বানাচ্ছেন!

আছে সমাজবিরহিত বোধ করার, কবিতা বা চিত্রকলা শিল্পীত বাস্তবের ছলনায় মুখ লুকোতে পারে। সিনেমার তেমন কোনও অন্তরাল নেই। সিনেমা জন্মসূত্রেই জনপদবধূ। যেমন 'পিয়াসা'র গুলাব। কবি ব্যোদলেয়ার কবেই যে মর্ত্যে লিখেছিলেন 'পাপের ফুল', গুরুর সৌজন্যে, 'পিয়াসা'র সূত্রে, এতদিনে সেই কুসুমে লেগে থাকা শিশির বিন্দু ঝরে



'পিয়াসা'য় গুরু দত্ত। স-জীবন বেঁচেছিলেন?

গুলাবকে পুনর্নির্মাণ করে ভোরের কল্লোলে। এই নারী যুগপৎ পতিতা ও উত্থিতা। যেন ব্যোদলেয়ারের প্রণয়িণী। আমাদের পাপ ও পুণ্যের মোহনা হয়ে এক ধরনের স্বস্তিবাচন ও স্থিরতার পটভূমি... আমরা ব্যোদলেয়ারকেই



■ আলোর ব্যবহার গুরুকে ভারতীয় সিনেমায় অনন্য করে তুলেছে। ‘পিয়াসা’র একটি দৃশ্য

উদ্ধৃত করি, ‘Shall I not see you till eternity?’ ‘দেবদাস’ উপন্যাসটি অবশ্য আমাদের আগেই জানিয়েছিল, ‘পিয়াসা’র গুলাব চন্দ্রমুখীর সহোদরা, ছায়াসঙ্গী। সেই যে কবে ওয়াহিদাকে আমরা প্রণয় পিপাসা পাঠাই, শ্রাবণ ঘন গগনমোহে আজও তার নিরসন হল না। আজও মনে হয় এই যুবতী ‘থির বিজুরি’।

ভাগ্যিস কবি ‘বিজয়’-এর ভূমিকায় নির্বাচিত অভিনেতা দিলীপকুমার প্রথম দিনের শুটিংয়ে আসতেই ব্যর্থ হলেন! আসলে দু’ বছর আগে বিমল রায়ের ‘দেবদাস’ হয়ে দিলীপ ভেবেছিলেন তাকে বোধ হয় এই চরিত্রেরও দায় নিতে হবে। তবে ‘বিজয়’ হিসেবে স্বয়ং গুরু দত্ত অভিনয়ের দায়িত্ব নেওয়ায় চলচ্চিত্র আখ্যান জীবনের তটরেখা পার হয়ে গেল! যা হতে পারত কোনও কবির নির্বিকল্প জীবনী, তা হয়ে দাঁড়াল কোনও স্রষ্টার পূর্ব নির্ধারিত আত্মহননের বিবরণী। গুরু-গীতা এবং ওয়াহিদার ত্রিকোণ সম্পর্ক যেন এই চিত্রনাট্যের অধিক। বিজয় যে একা দন্ডিত, তা কবিদের নিয়তি। কিন্তু খেয়াল করার বিষয় হল, এই আউটসাইডার বেছেও নিচ্ছে এমন একজনকে, যে পতিতা। আউটসাইডার। এক প্রান্তিকতা থেকে গুরু জীবন বিষয়ে তাঁর মন্তব্য সমূহ নিজের শিল্পকর্মে অন্তর্ভুক্ত করেন। আত্মজৈবনিকতা ও মেলোড্রামার অনন্যতার দিকে তাকালে গুরুকে তাই ঋত্বিকের সহযোদ্ধা বলে মনে হয়। প্রতিভার বিস্তর ফারাক থাকলেও কী আশ্চর্য! দু’জনেরই জন্ম ১৯২৫ সালে, গুরুর চেয়ে ঋত্বিক মাসচারেকের ছোট। দু’জনেরই জীবনাবসান মত্ততায়। ‘পিয়াসা’ যখনই দেখি তখনই ভাবি, স্বভাবের নৈরাজ্য পার হয়ে থরে থরে উপহার সম্ভার রয়ে গেছে আমাদের জন্য। আলোর এমন প্রত্যক্ষ অবদান, সে যুগের ক’টা ভারতীয় ছবিতে ছিল? ‘জানে কেয়া তুনে কহি’ গানটি যখন গাওয়া হচ্ছে, তখন গুরু তার ক্যামেরাম্যান ভি কে মূর্তির সহযোগিতায় আলোকে ব্যবহার করেছেন। প্রিন্সেপ ঘাটের উল্লম্ব থাম, ছায়া ও আলো যে বিন্যাস সৃষ্টি করেছে, তা অতুলনীয়। আর ওয়াহিদা ও গুরুর দু’ জোড়া চোখে সংকেত বিনিময় যেন অসামান্য গীতিকবিতা। এই যে কবিতার প্রতি স্বাভাবিক আসক্তি, এটাই গুরুর সিগনেচার। যখন ছোটি বহু আছড়ে পড়েন তার স্বামীর পদপ্রান্তে, তখন তার শরীর জুড়ে যে কামনার অগ্নিশিখা, তাকে প্রথম গুরু দত্তই স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। তিনি একমাত্র পরিচালক যিনি নারীর দেহ ও মনকে এক পাত্রে আনতে চেয়েছিলেন। মীনাকুমারীর চরিত্রের যে উত্থান ও পতন, তা যেন গুরুদত্তের কাছে অভিপ্রেত। গুরু চাইছিলেন, অন্ধকার থেকে ক্রমশ আরও অন্ধকারে মিশে যাক চরিত্রটি।

গুরু দত্ত কিন্তু আত্মজীবনীকেই সিনেমার ন্যারেটিভ বলে মনে করেছেন, ঋত্বিক ঘটকের মতো। এক দিক থেকে ঋত্বিক যখন প্রকৃত মহৎ শিল্পীর মতো ইতিহাসকে ব্যবহার করে

দু’ বছর আগে বিমল রায়ের ‘দেবদাস’ হয়ে দিলীপ ভেবেছিলেন তাকে বোধ হয় এই চরিত্রেরও দায় নিতে হবে। তবে ‘বিজয়’ হিসেবে স্বয়ং গুরু দত্ত অভিনয়ের দায়িত্ব নেওয়ায় চলচ্চিত্র আখ্যান জীবনের তটরেখা পার হয়ে গেল!



■ ‘পিয়াসা’ ছবির একটি দৃশ্যে গুরু দত্ত ও মালা সিনহা



■ প্রান্তিক জীবন এবং যৌন আকাঙ্ক্ষাকে অন্য রূপ দিয়েছেন গুরু দত্ত

ঘটে। তার ফলে জাত উদ্বেগ প্রতিহত করার উপায় অতিনাট্য বা মেলোড্রামার আতিশয্য। আরব সাগর তীরে ব্যক্তির মধ্য দিয়ে ঐতিহাসিক অনিশ্চয়তা ব্যাপ্ত হয়েছে গুরু দত্তর ছবিতে। নারীর ক্ষেত্রে তা অনেক সময়ই যৌন অবদমন বা আত্মত্যাগের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়। জিওফ্রে-নোয়েল স্মিথ একবার ঠাট্টা করে বলেছিলেন, If I can't have a phallas, I'll have a dorric column. 'পিয়াসা'র সূচনা এই বাক্যের প্রতিধ্বনি। আর পুরুষের ক্ষেত্রে কাস্ট্রেশনভীতি তো বিভিন্নভাবে চলে আসে। গুরুর ক্ষেত্রে সেই ভয় গানে বা স্পেসের ব্যবহারে চলে এসেছে। গুরু দত্তর গানে তাই

> কিছু নৈতিক শর্ত এসে যখন প্রতিস্থাপিত করে ভাঙনের মুখে দাঁড়ানো সভ্যতার বিষাদ, তখন এক ধরনের অবস্থানচ্যুতি ঘটে এবং শুরু হয় অতিনাটকিয়তা

নিজের আত্মতা অতিক্রম করেছেন 'কোমল গান্ধার' এবং 'যুক্তি তক্কো গপ্পো'তে, গুরু দত্ত তখন পারেননি। তিনি হিন্দি সিনেমার অতি নাটকীয়তাতে আবদ্ধ হয়ে গেছেন। ফলে কিছুতেই 'কাগজ কে ফুল' পারেনি'কোমল গান্ধার' হয়ে উঠতে। তার দু'টি কারণ। এক, গুরু জানতেন মেলোড্রামা, সভ্যতা রূপান্তরের সময় যে অসাম্য তৈরি হয়, তাকেই ব্যক্তির মধ্যে ধারণ করে। কিন্তু যেটা জানতেন না, তা হল, এই অভ্যাসকে ইতিহাস চেতনার সঙ্গে সংযুক্ত না করলে তা নেহাত গল্প হয়ে থেকে যায়। আজ যখন গুরু দত্ত এবং তাঁর কাজকে দেখি, তার প্রতিটি সংগীতের ব্যবহার কোথাও গিয়ে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও শচীন দেববর্মণের কথা মনে পড়ায়। আলোর ব্যবহার দেখলেই মনে হয় ভি কে মূর্তির কথা। আসক্তির সঙ্গে মিলে গিয়েছেন ওয়াহিদা রেহমান এবং সৌন্দর্যের সঙ্গে মীনাকুমারী। এ যেন স্মৃতিতেই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়া এক রূপকথার গল্প। মনে হয় ঈশ্বর আমাদের স্মৃতির সঞ্চয় দিয়েছেন, তাই আমরা গুরু দত্তর মতো অপচয়কেও মনে রাখতে পারছি। শতবর্ষে ভারতীয় ছবিতে গুরু দত্তর অবদানের কথা আরও বেশি করে আলোচনা হওয়া উচিত। তিনি এমন এক ভগ্নস্তূপ, যাঁকে খনন করলে হরপ্পা সভ্যতার লুপ্ত ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।



■ 'সাহেব বিবি অউর গুলাম'-এ গুরু দত্ত ও ওয়াহিদা রেহমান

পিটার ব্রুকসের মতো তাত্ত্বিকেরা মনে করেন, কিছু নৈতিক শর্ত এসে যখন প্রতিস্থাপিত করে ভাঙনের মুখে দাঁড়ানো সভ্যতার বিষাদ, তখন এক ধরনের ডি সেন্টারিং বা অবস্থানচ্যুতি

এত বিরহিনী শ্রীরাধিকা। আর দৃশ্যনির্মাণে এত ভগ্নস্তূপ। এই রহস্যের উন্মোচন সম্ভব হলেই আমরা দেখতে পাব শতবর্ষের ধ্বংসাবশেষে জ্বলে উঠেছে এক অলৌকিক আলো।



■ কনেরু হাম্পি

ইতিহাস হাম্পির

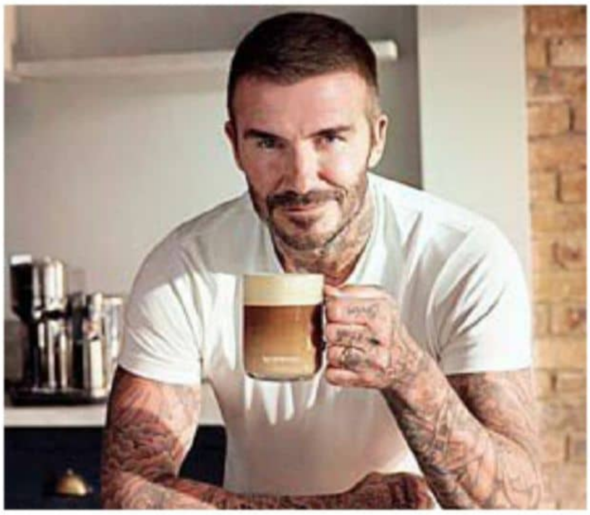
আন্তর্জাতিক দাবা দিবসে ইতিহাস গড়লেন কনেরু হাম্পির। প্রথম ভারতীয় হিসেবে ফিডে মহিলাদের বিশ্বকাপে সেমিফাইনালে উঠলেন তিনি। কোয়ার্টার ফাইনালে প্রথম দিনই হাম্পি এগিয়ে গিয়েছিলেন ১-০ গেমে, আইএম সং উজিনের বিরুদ্ধে। গত বছর এই প্রতিযোগিতায় হারিকা দ্রোণাভল্লির কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠাই ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে সেরা ফল ছিল। তা টপকে গেলেন হাম্পি। শেষ চারে তিনি মুখোমুখি হবেন শীর্ষবাছাই চিনের লেই তিংজির (এই লেখা প্রেসে যাওয়া পর্যন্ত)। এই বিশ্বকাপ থেকে সেরা তিন জন ২০২৬ ক্যান্ডিডেটসে যোগ্যতা অর্জন করবেন। ভারতীয় দাবাড়ুদের এর মধ্যে একটি স্থান নিশ্চিত।

নতুন সরফরাজ়

কয়েক মাসের মধ্যেই আমূল পরিবর্তন দেখা গেল তাঁর শরীরে। কথা হচ্ছে, সরফরাজ় খানকে নিয়ে। ভারতীয় এই ক্রিকেটারের প্রতিভা নিয়ে কারও মনেই কোনও সন্দেহ নেই। শুধু সমস্যা ছিল তাঁর ফিটনেস নিয়ে। অতিরিক্ত ওজন যে একেবারেই খেলোয়াড়সুলভ নয়, তা নিয়ে সরফরাজ়কে বহু কথা শুনতে হয়েছে। এবার একেবারে অলৌকিক খেল দেখালেন তিনি। ১৭ কেজি ওজন কমালেন সরফরাজ়। শোনা গিয়েছে, ডায়েট থেকে ভাত এবং রুটি সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দিয়েছিলেন সরফরাজ়। তাতে দু' মাসে ফল পেয়েছেন। সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়া সফরের দলে তাঁকে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু একটি ম্যাচেও সুযোগ পাননি। ইংল্যান্ড সফর থেকে বাদ পড়েছেন। ইন্ডিয়া এ-র হয়ে শতরান করা সত্ত্বেও সুযোগ পাননি। এবার ওজন কমিয়ে জবাব দিলেন তিনি।



■ সরফরাজ়ের দুই রূপ



■ ডেভিড বেকহ্যাম

চুল কেটে বিপদে বেকহ্যাম

নতুন নতুন স্টাইলে তিনি সবসময় থাকেন চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে। এ বারে পুরনো চুলের স্টাইলে ফিরতে চেয়েছিলেন ডেভিড বেকহ্যাম। কিন্তু তাতেই ঘটে গেল বিপত্তি। হেয়ারস্টাইলিস্টের ভুলে মাথার মাঝের চুল উঠে গিয়েছে বেকহ্যামের। দাগ পড়ে গিয়েছে মাথায়। আর তা নিয়ে সমাজ মাধ্যমে শুরু হয়েছে চর্চা। বেকহ্যামের স্ত্রী ভিক্টোরিয়া এই চুলের ছাঁটের ছবি তুলে দেন সমাজ মাধ্যমে। এই ছাঁট যে তাঁর একেবারেই ভাল লাগেনি, তাও জানিয়ে দিয়েছেন। আসলে ২০০০ সালের শুরুর দিকে বেকহ্যামের এরকম চুল ছিল। তা জনপ্রিয় ছিল। সারা বিশ্ব তখন তাঁকে এই ছাঁটে চিনেছিল। সেটাই ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন বেক্‌স। আর তখনই ঘটল বিপত্তি।

মেয়েকে নিয়ে ধোনির আক্ষেপ

ভারতের তরুণ প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের মধ্যে ফিটনেস কমে যাওয়া নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন মহেন্দ্র সিংহ ধোনি। এমনকি, তাঁর নিজের মেয়ে জিভাও বেশি খেলাধুলো করে না। এই আক্ষেপ গোপন করেননি দেশীয় ক্রিকেটের এই প্রাক্তন অধিনায়ক। ৪৪ বছর বয়সেও ধোনির ফিটনেসে মুগ্ধ ক্রিকেটপ্রেমীরা। অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায় দুই সেকেন্ডেরও কম সময়ে স্টাম্পিং... ধোনি দলে নিজের অপরিহার্যতা প্রমাণ করেছেন। তাঁর শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনযাপনের দৃষ্টান্তও দেওয়া হয় সকলকে। সম্প্রতি রাঁচিতে এক অনুষ্ঠানে ধোনি বলেছেন, ''আমাদের ভারতীয়দের গড় ফিটনেসের স্তরও কমে গিয়েছে। আমার মেয়েও খুব বেশি শারীরিক পরিশ্রম করে না। ওর খেলাধুলোয় আগ্রহ কম। অবশ্য অনেকেই এখন খেলাধুলো করেন না। আমাদের তাই এমন পরিকল্পনা করতে হবে যেখানে শারীরিকভাবে সক্রিয় থাকা যাবে।''



■ কন্যার সঙ্গে ধোনি

বর্ষার মধ্যেই বাতাসে পুজো ও দিওয়ালির গন্ধ। তার মধ্যেই চলছে তারকাদের সেলিব্রেশন, শুট, ছবির প্রচার। তাঁদের সঙ্গে আনন্দলোক



১



২



৩



৪

৫



৬



১ মুম্বইয়ে একটি অনুষ্ঠানে এসে ক্যামেরার সামনে পোজ় দিলেন সুনীল শেট্টি, টাইগার শ্রফ এবং জ্যাকি শ্রফ

২ ‘ডিয়ার মা’র প্রিমিয়ারে এসে স্বমহিমায় ধরা দিলেন জয়া আহসান

৩ লন্ডনে ‘প্রজাপতি ২’র শুটিংয়ে অতনু রায়চৌধুরী, অভিজিৎ সেন এবং দেব

৪ ‘সইয়ারা’ ছবির সাফল্যের পর বাড়ির সামনে অহন পাণ্ডে ও অনীত পাড্ডা

৫ মুম্বইয়ে একটি অনুষ্ঠানে এসে সঞ্জয় দত্তের সঙ্গে খোশগল্পে ব্যস্ত শিল্পা শেট্টি

৬ মুম্বইয়ে এক খুদে ভক্তের সঙ্গে সলমন খান

৭ মুম্বইয়ে গিয়ে মোবাইল ফোনে চোখ প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের

৮ 'ধুমকেতু'র প্রচারে প্রযোজক রানা সরকারের সঙ্গে শুভশ্রী


৭

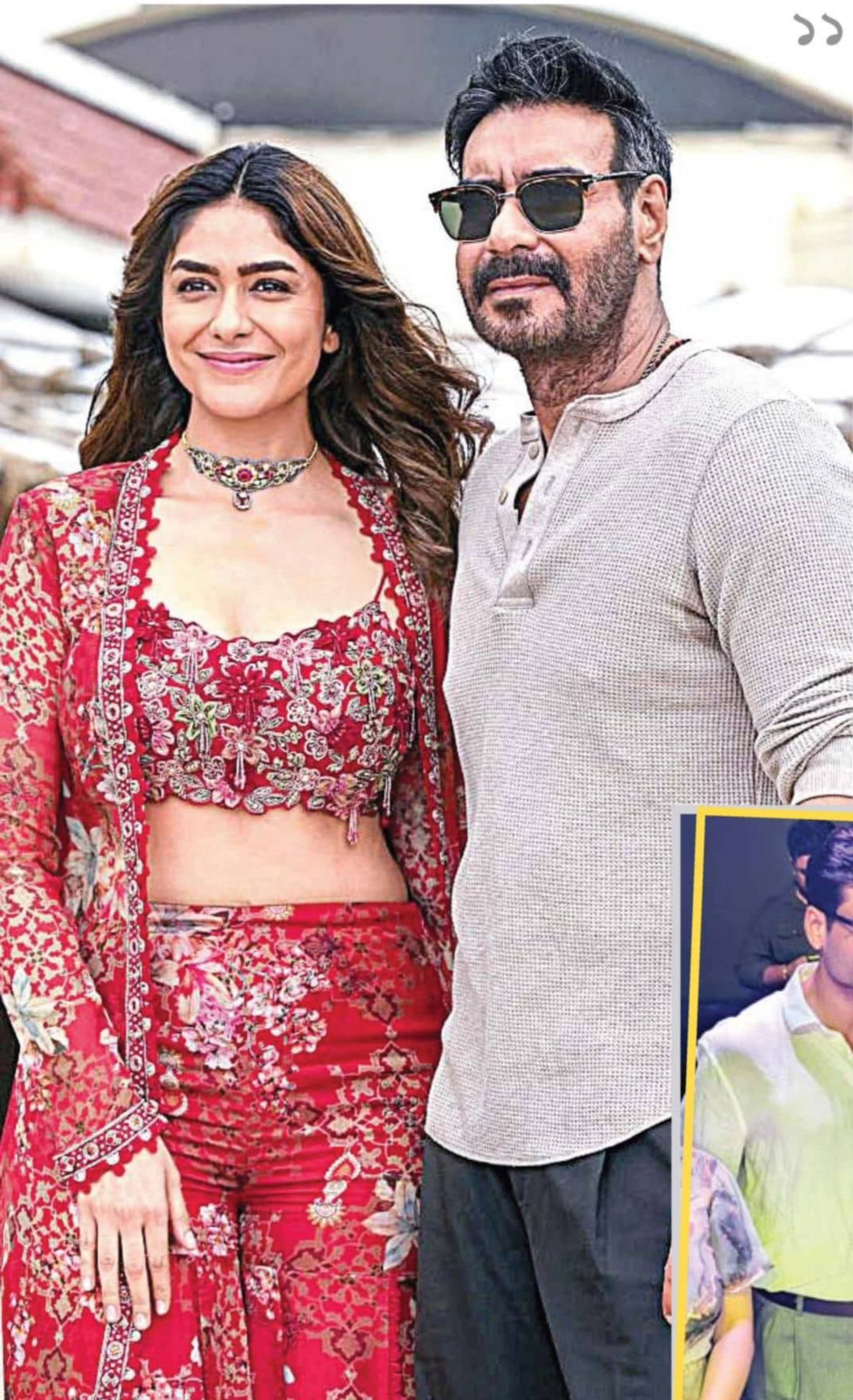

৮


৯



১০

ছবিগুলো তুলেছেন
প্রবীর মিত্র: ১২
অনির্বাণ সাহা: ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯



১১

৯ ‘ধড়ক ২’র প্রচারে এসে একে-অপরের সঙ্গে মজলেন সিদ্ধান্ত চতুর্বেদী ও তৃপ্তি দিমরি

১০ নতুন সিরিজ় ‘বীরাঙ্গনা’র ট্রেলার লঞ্চে নীরঞ্জন ও সন্দীপ্তা সেন

১১ ‘সন অফ সর্দার ২’ র প্রচারে মৃণাল ঠাকুর ও অজয় দেবগন

১২ নতুন বাংলা ছবি ‘গুডবাই মাউন্টেন’-এর মিউজ়িক লঞ্চে ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত ও ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত



১২

১৩ নিজের ফেভারিট চাইনিজ় কুজ়িন খেতে ব্যস্ত ঋতব্রত মুখোপাধ্যায়

১৪ 'দ্য একেন: বেনারসে বিভীষিকা'র সাকসেস পার্টিতে সোমক, অনির্বাণ, জয়দীপ ও সুহোত্র

১৫ 'উই টাইম' কাটাচ্ছেন দর্শনা বণিক ও সৌরভ দাস

১৩



১৪



১৫



ছবিগুলো তুলেছেন অনির্বাণ সাহা: ২, ১৪, ১৬







১৬ বাংলা ছবি 'ডিয়ার মা'র প্রিমিয়ারে মনামী ঘোষ

১৭ নিজের প্রিয় পোষ্যর সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন নুসরত জাহান

১৮ মুম্বইয়ে এক অনুষ্ঠানে ক্যামেরাবন্দি আদিত্য রায় কপূর



আমার জীবনের না পাওয়া

সর্বেন্দ্র সিংহের শেষকৃত্যে উপস্থিত থাকার অনুমতি পাননি তিনি। যে মানুষটার জন্য নিজের সবকিছু উজাড় করে দিলেন, তাঁকে শেষবারের মতো দেখতে পেলেন না। আনন্দলোক-এর জন্য লেখা আত্মজীবনীতে **সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়** বললেন তাঁর জীবনকথা। এবার **শেষ পর্ব**

দেখতে-দেখতে আনন্দলোক-এ আমার জীবনকাহিনীর সপ্তম ও শেষ পর্বে পৌঁছে গেলাম। জীবনের প্রায় পুরোটাই আপনাদের সঙ্গে খোলাখুলিভাবে শেয়ার করেছি। ব্যক্তিগতজীবন থেকে কর্মজীবন সবকিছুই খোলসা করলাম। জানি না

ভাল রাখার, আমি-ই জোর করে নিজের দিব্যি দিয়ে, খাবার না খেয়ে ওঁকে জোর করে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছি, আমি বম্বেতে ওঁর ট্রিটমেন্টেরও খরচ বহন করেছি। কিন্তু আমি-ই হয়ে গেলাম ভিলেন! এটাই আক্ষেপ থেকে গেল। আমার সর্বেন্দ্রর শেষকৃত্যের সময়ও ওঁর কাছে যেতে দেওয়া হয়নি। যে মানুষটাকে এত ভালবাসলাম, তাঁর শেষকৃত্যে না থাকতে পারাটা যে কতটা যন্ত্রণাদায়ক তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না।



■ দাসানি স্টুডিয়োর জন্মদিনে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে কেক কাটছেন সাবিত্রী

উত্তমদা আমারও খুব প্রিয়। কিন্তু প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই তো সাদা-কালোর মিশ্রণ থাকে, তাই উত্তমদার খারাপগুলোও লুকোইনি।

আপনারা আমাকে কী চোখে দেখবেন, কিন্তু আমি কথা শেয়ার করার ক্ষেত্রে কোনও রাখঢাক করিনি। অনেকেই হয়তো রেগে যাবেন কারণ আমি আপনাদের প্রিয় উত্তমদাকে নিয়ে প্রচুর ভালমন্দ কথা বলেছি। বিশ্বাস করুন, উত্তমদা আমারও খুব প্রিয়। খুব কাছের একজন। কিন্তু প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই তো সাদা-কালোর মিশ্রণ থাকে, আমি উত্তমদার ভাল দিকগুলো যেমন বলেছি, খারাপগুলোও লুকোইনি। আরও অনেককিছু জানি কিন্তু সেটা তাঁর ব্যক্তিগত বিষয় তাই ওগুলো নিয়ে কথা বলিনি। কিন্তু যেখানে আমার জীবন জড়িয়ে আছে সেই পর্বগুলো বলতেই হত। যাই হোক, গত পর্বে সর্বেন্দ্রর গল্প দিয়ে শেষ করেছিলাম। ওঁর শরীরের অবনতির কথা জানতে পেরে আমি কোনওকিছু না ভেবে ওঁর বাড়ির পথে রওনা দিই। কিন্তু ওখানে পৌঁছে জানতে পারি সর্বেন্দ্রর অবস্থা খুবই খারাপ। মৃত্যুমুখী প্রায়। আমি কান্নায় ভেঙে পড়ি, অথচ সর্বেন্দ্রর স্ত্রী আমাকে ওঁর স্বামীর কাছে যাওয়ার অনুমতি দেন না। খারাপ ব্যবহার করে আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দেন। আগে বুঝতে না পারলেও আমার ধারণা, উনি এতদিনে বুঝে গিয়েছিলেন যে ওঁর স্বামীর সঙ্গে আমার বন্ধুত্বর থেকেও বেশি গভীর সম্পর্ক ছিল। দেখুন, আমি কখনওই কারও ঘর ভাঙতে চাইনি। উত্তমদারও না, সর্বেন্দ্রর‌ও না। তাই সর্বেন্দ্রর স্ত্রী আমার সঙ্গে যা করেছেন তাতে



■ দেবলীনা দত্তের সঙ্গে একটি সিরিয়ালের শুটে

আমি অন্যায় কিছু দেখি না। কিন্তু আমার যেটা খারাপ লাগা থেকে গেছে তা হল সকলে আমাকেই অপরাধী ভাবলেন। এমন একটা পরিস্থিতি হল যেখানে মনে হল যে সর্বেন্দ্রর শারীরিক অবনতির মূল কারণ আমি। অথচ এটা কেউ জানতেই পারলেন না যে প্রত্যেক মুহূর্তে আমি চেষ্টা করে গিয়েছি সর্বেন্দ্রকে

আমার নাতনি কাঞ্চন মল্লিকের প্রাক্তন স্ত্রী

অনেক তো অতীতের গল্প বললাম। কিন্তু আমি তো এখনও ফুরিয়ে যাইনি। তার প্রমাণ আপনারা সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত ‘আমার বস’ ছবিতেই পেয়েছেন। শিবু (শিবপ্রসাদ



■ 'আমার বধূয়া' ছবিত দেবশ্রী রায়ের সঙ্গে সাবিত্রী

সকালে বাজার থেকে কী মাছ আনা হবে, সেটা কী সবজি দিয়ে রান্না করা হবে, সব কিন্তু আমিই ঠিক করি। কয়েকমাস আগে অবধি তো ঘরও পরিষ্কার করতাম।

মুখোপাধ্যায়) তো আমাকে বলেছেন, গোটা ছবির প্রাণভোমরা লুকিয়ে ছিল একেবারে শেষে এন্ড ক্রেডিটের জায়গাটায়। যখন পরদা জুড়ে আমি আর রাখী গুলজার লুডো খেলছি আর কথা বলছি। একজন দর্শকও সিট ছেড়ে ওঠেননি। আরও ভাল কাজ পেলে করার ইচ্ছে আছে। তবে এখন তো এমনিতেই খুব কম ভাল কাজ হয়, তার উপর আবার আমার মনের মতো চরিত্র পাওয়া কঠিন। আপাতত আমার এই মস্ত বড় বাড়িতে একাধিক কাজের লোক আছে, কিন্তু সব আমাকেই তদারকি করতে হয়। সকালে বাজার থেকে কী মাছ আনা হবে, সেটা কী সবজি দিয়ে রান্না করা হবে, সব কিন্তু আমিই ঠিক করি। কয়েকমাস আগে অবধি তো ঘরও আমি-ই পরিষ্কার করতাম তবে এখন আর শরীর দেয় না। তবে



■ একটি অনুষ্ঠানে নাতনি পিঙ্কি ও প্রযোজক অতনু রায় চৌধুরীর সঙ্গে

শরীর ভাল লাগলে রান্নার সবজিগুলো এখনও আমি কাটি। সংসার না করতে পারলেও সংসারের এই কাজগুলো কিন্তু করার সুযোগ পেয়েছি। আর আমার সঙ্গে রয়েছে আমার সর্বক্ষণের বন্ধু, আমার লাইফ সাপোর্ট, আমার নাতনি, পিঙ্কি। পিঙ্কি সিরিয়ালে অভিনয় করে, ওকে আপনারা সকলেই চেনেন। ওর কাঞ্চন মল্লিকের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল কিন্তু সেটা ছিল ওর জীবনের একটা ভুল সিদ্ধান্ত। এখন ওর আর কাঞ্চনে ডিভোর্স হয়ে গিয়েছে, বাচ্চার দায়িত্বও আমার নাতনির কাছেই আছে। সম্পর্কে পিঙ্কির ঠাম্মি মাধবীলতা দেবী আমার নিজের বোন ছিলেন। সেই অর্থে রক্তের সম্পর্কের দিক থেকে পিঙ্কিই আমার একমাত্র সাপোর্ট এখন। অনেকেই জানতেন না যে আমার নাতনি কাঞ্চনের প্রাক্তন স্ত্রী। পিঙ্কি খুব ভাল মেয়ে, আমাকে সবসময় আগলে-আগলে রাখে। আমি কখন কী ওষুধ খাব, খাবার খেলাম কী না, সব পিঙ্কির নখদর্পণে। পানের নেশাটা কিন্তু এখনও আমার রয়ে গিয়েছে। যা-ই হয়ে যাক না কেন, ওটা আমি ছাড়তে পারব না। আর এখন শীতটা খুব বেশি লাগে, গরমকালেও মনে হয় গায়ে অন্তত একটা চাদর চাপিয়ে রাখি।

ইন্ডাস্ট্রিতে বন্ধু হয় না

বর্তমানে বাড়ির বাজারের তদারকি করা, সবজি কাটা, এসব বাদে বেশিটা সময় শুয়ে-শুয়েই সময় কাটে। নিজে একটা সময় অনেক টিভি সিরিয়ালে কাজ করেছি। তবে এখন যে সিরিয়াগুলো হয় সেগুলো দেখার মতো নয়। তাই টিভি-ও খুব একটা দেখি না। খবরের চ্যানেল খুললে সেই অপরাধের খবর বা রাজনীতির। মাঝেমধ্যেই বই পড়ি কিন্তু একটা পড়লে চোখের সমস্যা হয়। তবে এই এতবছরে একটা জিনিস বুঝেছি, ইন্ডাস্ট্রিতে বন্ধু হয় না। দেখুন এখন আমি একা বাড়িতে, ইন্ডাস্ট্রির কোনও বন্ধু তো খোঁজ নেন না। আমার এমনিতেই জীবনে বন্ধুবান্ধব কম, তার

উপর ইন্ডাস্ট্রির বন্ধু জ়িরো। তবে এই বেশ ভাল আছি। নিজের সঙ্গে সময় কাটানোর মধ্যেও একটা আলাদা শান্তি আছে। বাইরে কোনও সিনেমার অনুষ্ঠানে গেলে ইন্ডাস্ট্রির অনেকেই এসে অনেক বড়-বড় কথা বলেন। 'আপনার অসুবিধে হলে বলবেন', 'আমরা

> এই ভেবে খারাপ লাগে যে কেরিয়ারে আমাকে পরিচালকরা আরও সুযোগ দিতে পারতেন, আমার অভিনয় ক্ষমতাকে আরও ব্যবহার করা যেত।

তো আছি সবসময়'...কিন্তু বাড়িতে কেউ ফোন করে একবার জিজ্ঞেসও করেন না শরীর কেমন আছে! পুরোটাই একটা ফেক দুনিয়া। তবে এসব নিয়ে আক্ষেপ নেই। শুধু এই ভেবে খারাপ লাগে যে কেরিয়ারে আমাকে পরিচালকরা আরও সুযোগ দিতে পারতেন, আমার অভিনয় ক্ষমতাকে আরও ব্যবহার করা যেত। যে চরিত্র আমার পাওয়ার ছিল, সেগুলো পাইনি। এখনও কোনও বই পড়ে ভাল লাগলে মনে আমি এই চরিত্রটা করতে পারতাম। বা কোনও সিনেমা দেখে মনে হল এই ছবির নায়িকার চেয়ে আমি থাকলে ঢের ভাল অভিনয় করতাম! আসলে শিল্পীর জীবন এমনই যে কখনওই আমরা একশো শতাংশ তৃপ্ত হই না। তবে আমি কাজ চালিয়ে যেতে চাই। খুব সিলেক্টিভ কাজ করব কিন্তু কাজ করা থামাব না। আমি কোনওভাবেই অবসর নিতে চাই না। কাজ করতে-করতেই মরতে চাই...

সমাপ্ত



'আমার বস' ছবিতে রাখী ও সাবিত্রী

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় অভিনীত উল্লেখযোগ্য ছবির তালিকা

- বসু পরিবার (১৯৫২)
- সুভদ্রা (১৯৫২)
- মরুতীর্থ হিংলাজ (১৯৫৯)
- গলি থেকে রাজপথ (১৯৫৯)
- দুই ভাই (১৯৬১)
- শেষ অঙ্ক (১৯৬৩)
- মোমের আলো (১৯৬৪)
- কাল তুমি আলেয়া (১৯৬৬)
- পথে হল দেখা (১৯৬৮)
- নিশিপদ্ম (১৯৭০)
- ধন্যি মেয়ে (১৯৭১)
- মাল্যদান (১৯৭১)
- শেষ পর্ব (১৯৭২)
- মৌচাক (১৯৭৪)
- ব্রজবুলি (১৯৭৯)
- প্রাক্তন (২০১৬)
- ঠাম্মার বয়ফ্রেন্ড (২০১৬)



তৎকালীন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের হাত থেকে জাতীয় পুরস্কার পাচ্ছেন সাবিত্রী



চালক ও গৃহকর্মীকে ১ কোটি ১৪ লাখ!

ইন্ডাস্ট্রিতে আলিয়া ভট্টের উদার মনের কথা সকলেই জানেন। একাধিক দাতব্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত তিনি। মুম্বইয়ের এরকম অনেক হাসপাতাল আছে যেখানে প্রতিবছর মোটা অঙ্কের অনুদান দেন আলিয়া। তবে এসব নিয়ে কোনও প্রচার করতে পছন্দ করেন না তিনি। সম্প্রতি সূত্র মারফত জানা যায়, তাঁর গাড়ির চালক এবং গৃহকর্মীকে বাড়ি কেনার জন্য আলিয়া মোট ১ কোটি ১৪ লাখ টাকা দিয়েছেন! কোভিডের সময়েও কিন্তু আলিয়া তাঁর বাড়ির সমস্ত স্টাফকে অর্থ সাহায্য করেছিলেন বলে শোনা গিয়েছিল। আলিয়ার এই মহানুভবতার জন্য আনন্দলোক-এর তরফ থেকে তাঁকে বাহবা দিতেই হয়।

আলিয়া ভট্ট

প্রয়াত ‘ডন’-এর পরিচালক

সিনেমার ইতিহাসে এক-একটা ছবি কাল্টের পর্যায়ে চলে যায়। অমিতাভ বচ্চন অভিনীত ‘ডন’ সেরকমই একটি ছবি। সেই ছবির পরিচালক চন্দ্র বারোট শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। প্রায় সাতবছর ধরে তিনি পালমোনারি ফাইব্রোসিসে ভুগছিলেন। অনেকদিন ধরে শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় কষ্ট পাচ্ছিলেন। চন্দ্রের জন্ম ও বেড়ে ওঠা তানজ়ানিয়াতে। এরপর তিনি ব্যাংককে ছিলেন বেশ কয়েকবছর। পরে ভারতে বসবাসের সিদ্ধান্ত নেন। মনোজ কুমারের পরামর্শে বিনোদনজগতে পা রাখেন। শুরুতে সহকারী পরিচালক হিসেবে কাজ করেন ‘পূরব অউর পশ্চিম’, ‘ইয়াদগার’, ‘শোর’, ‘রোটি কপড়া অউর মকান’-এর মতো ছবিতে।



চন্দ্র বারোট

ধর্মা প্রোডাকশনের নতুন ফেস

এর আগে ‘জুবিলি’, ‘খুফিয়া’, ‘ভুল চুক মাফ’-এ তাঁকে আপনারা দেখেছেন। তবে এবার যেন কেরিয়ারর এক ধাপ এগিয়ে গেলেন ওয়ামিকা গাব্বি। কারণ, করণ জোহরের নজর পড়েছে তাঁর উপর। করণ তাঁর প্রযোজনার নতুন রোম্যান্টি কমেডি ‘কুকু কী কুন্ডলি’-তে নতুনভাবে লঞ্চ করতে চলেছেন ওয়ামিকাকে। ছবিতে ওয়ামিকার বিপরীতে থাকবেন ডিজিট্যাল মিডিয়ামের সেনসেশন ভুবন বাম আর ছবিটি পরিচালনা করবেন শরণ শর্মা। স্বভাবতই ওয়ামিকা এই ছবির প্রস্তাব পেয়ে বেজায় খুশি। তাঁর প্রিয় পরিচালকের তালিকাতে যে করণের নাম প্রথমেই আসে!



ওয়ামিকা গাব্বি



সলমন খান

তিন খান সেরা

সম্প্রতি একটি কমর্শিয়াল ব্র্যান্ড এনডর্স করতে আসেন সলমন খান। সেখানে উপস্থিত সাংবাদিকদের তরফ থেকে তাঁকে বলিউডের নতুন স্টারদের নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। সেই প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গিয়ে সলমন বলেন, স্টার এখন আর কেউ নন। তিন খান, অর্থাৎ সলমন, শাহরুখ ও আমিরের পর স্টার প্রথা-ই নাকি বলিউড থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। সলমনের এই মন্তব্যের পর মিশ্র প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় ইন্ডাস্ট্রিতে। একাংশ যেরকম সলমনের বক্তব্যকে সমর্থন জানিয়েছে, অন্যদিকে একাংশ সলমনের এরকম মন্তব্যের নিন্দে করেছে।



তনুশ্রী দত্ত। (ইনসেটে) ইনস্টাগ্র্যামের ভিডিয়োর স্ক্রিনশট

তনুশ্রীর অভিযোগ

বলিউডে ‘মি টু’ আন্দোলন শুরু করেছিলেন তিনি। ২০১৮ সালে নানা পাটেকরের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ আনেন। তবে এবার কর্মক্ষেত্রে নয়, নিজের বাড়ির অন্দরেই হয়রানির অভিযোগ করলেন তনুশ্রী দত্ত। ইনস্টাগ্র্যামে এক ভিডিয়োতে তনুশ্রী বলেন, ‘নিজের বাড়িতে হয়রানির শিকার হচ্ছি। আমি এখনই পুলিশকে ডেকেছিলাম ভয় পেয়ে। পুলিশ এসে থানায় গিয়ে অভিযোগ জানাতে বলেছে। আমি খুবই অসুস্থ। গত চার থেকে পাঁচ বছরে এত হয়রানি সহ্য করেছি যে শরীরটাই ভেঙে পড়েছে।’ ভিডিয়োতে তনুশ্রী আরও অভিযোগ করেছেন, বাড়িতে তিনি গৃহকর্মী রাখতে পারছেন না এবং তাঁর ঘরও একেবারে অগোছালো অবস্থায় আছে। অভিনেত্রী বলেন, ‘আমি কিছুই ঠিকমতো কিছু করতে পারছি না। ঘর একেবারে অগোছালো। গৃহকর্মী রাখতেও ভয় লাগে, আগে যাদের রেখেছিলাম, তারা চুরি করত, ঝামেলা করত। তাই এখন সব কাজ নিজেকেই করতে হয়। এর মধ্যেও লোকজন দরজার বাইরে এসে বিরক্ত করে, নিজের ঘরেই এখন নিরাপদ নই।’ ভিডিয়োর ক্যাপশনে তনুশ্রী লেখেন, ‘আর পারছি না এই হয়রানি সহ্য করতে!’ জানা গিয়েছে ২০১৮ সালের ‘মি টু’ মুভমেন্টের পর থেকেই চলছে এই হয়রানি।



■ বুমরাকে ঘিরে খেলার মাঠে উচ্ছ্বাস

‘নয়া ভারত’: নতুন স্বপ্ন

ইংল্যান্ড সফরে গিয়ে শুভমন গিলের নেতৃত্বে ভারতীয় দল বুঝিয়ে দিল, তারা অনভিজ্ঞ হলেও, নিস্তেজ নয়। বরং লড়াকু মানসিকতায় বুনতে পারেন ভবিষ্যতের স্বপ্ন। লিখেছেন **সায়ক বসু**

এই লেখা যখন প্রেসে যাচ্ছে, তখন ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারত ম্যাঞ্চেস্টারে চতুর্থ টেস্ট খেলা শুরু করে দিয়েছে। ফলাফল যাই হোক না কেন, এটুকু বলাই যায় যে, শুভমন গিলের নেতৃত্বে নতুন দল কঠিন সিরিজে গিয়ে ইংল্যান্ডকে প্রথম তিনটি টেস্টে যে প্রতিযোগিতার মুখে ফেলেছে, তা কুর্নিশযোগ্য। এখনও পর্যন্ত কোনও ভারতীয় দলই ইংল্যান্ডে গিয়ে পরপর তিনটি টেস্ট একেবারে পঞ্চম দিনেও, হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর্যায় নিয়ে যেতে পারেনি। ভারতের এই নতুন দল পেরেছে। যদিও পরিসংখ্যানই শেষ কথা বলে, কিন্তু যাঁরা খেলা নিয়মিত, ধারাবাহিকভাবে দেখেছে, তারা নিশ্চয়ই স্বীকার করবে যে, ছোটখাটো কিছু ভুল না করলে এবং ভাগ্য সঙ্গ দিলে, যে ২-১ ফলে ভারত এখন পিছিয়ে আছে, তা অবলীলায় ৩-০ হয়ে যেতে পারত। প্রথম টেস্টের কথাই ধরা যাক, শুভমন গিল, ঋষভ পন্থের শতরানের জেরে ভারত ইংল্যান্ডকে ৩৭১ রানের লক্ষ্যমাত্রা দেয় চতুর্থ ইনিংসে। কিন্তু লিড তার চেয়ে অনেক বেশি হতে পারত, যদি যশস্বী জয়সওয়াল এবং দলের বাকিরা মোট ছ’টি ক্যাচ মিস না করতেন। দ্বিতীয় টেস্টে সেই সমস্যা হয়নি বলে, ভারত খুব সহজে জিতেছে। তৃতীয় টেস্টেও ভারত জিতত যদি, প্রথম

ইনিংসে ঋষভ পন্থ ওইরকমভাবে রানআউট না হতেন। ভারত ৫০ রানের লিড নিয়ে নিলেই, শেষে জাদেজাকে অতটা চাপ নিয়ে খেলতে হত না।

তবে এসবই খেলার অঙ্গ। হার-জিত থাকবেই। এবং সব ম্যাচ জিততে হবে, এমনও কোনও কথা নেই। যেটা দরকার, সেটা হল লড়াই করার মানসিকতা। বুমরা-সিরাজ-সুন্দর-রাহুলরা সেই লড়াইয়ের মানসিকতায় ১০০য় ১০০ পেয়ে বসে আছেন। মনে থাকার কথা, সিরিজ় শুরুর আগে প্রায় সমস্ত প্রাক্তন বিশেষজ্ঞ এই 'নয়া ভারত'কে লড়াইয়ের দাবিদার বলেই মনে করেনি। ইংল্যান্ড 'বাজ়বল' খেলে ভারতকে প্রায় উড়িয়ে দেবে, এমনটাই মনে করা হয়েছিল। কিন্তু আদতে হল কী? এজবাস্টনে গত ছয় দশকের মধ্যে প্রথমবার জিতে রেকর্ড গড়ল টিম ইন্ডিয়া। আর তাতে ইংল্যান্ড এত ব্যাকফুটে চলে গেল যে, বাজ়বল ছেড়ে সনাতনী টেস্ট ক্রিকেট খেলা শুরু করল। যে নতুন দল, অভিজ্ঞ দলের মনে ভয় ঢুকিয়ে খেলার ধরনই বদলে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে, সেখানে তাদের সাফল্য-অসাফল্যকে কি শুধু পরিসংখ্যান দিয়ে দেখাটা



আকাশদীপের সেলিব্রেশন



কে এল রাহুল করলেন সেঞ্চুরি



সিরাজ যেন বিশ্রাম নিতে চান না একেবারেই

ঠিক?
সিরিজ় শুরুর আগে, অধিনায়ক শুভমন গিল বলেছিলেন, বিরাট কোহলি এবং রোহিত শর্মারা টিম ইন্ডিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার



ভারতীয় দল কি জিততে পারবে এই সিরিজ়?



শুভমন অধিনায়ক হতেই, ফিরলেন ফর্মে



রবীন্দ্র জাদেজা বোঝালেন, কেন তিনি সেরা

ইংল্যান্ড ‘বাজ়বল’ খেলে ভারতকে প্রায় উড়িয়ে দেবে, এমনটাই মনে করা হয়েছিল। কিন্তু আদতে হল কী? এজবাস্টনে গত ছয় দশকের মধ্যে প্রথমবার জিতে রেকর্ড গড়ল টিম ইন্ডিয়া। আর তাতে ইংল্যান্ড এত ব্যাকফুটে চলে গেল যে, বাজ়বল ছেড়ে সনাতনী টেস্ট ক্রিকেট খেলা শুরু করল

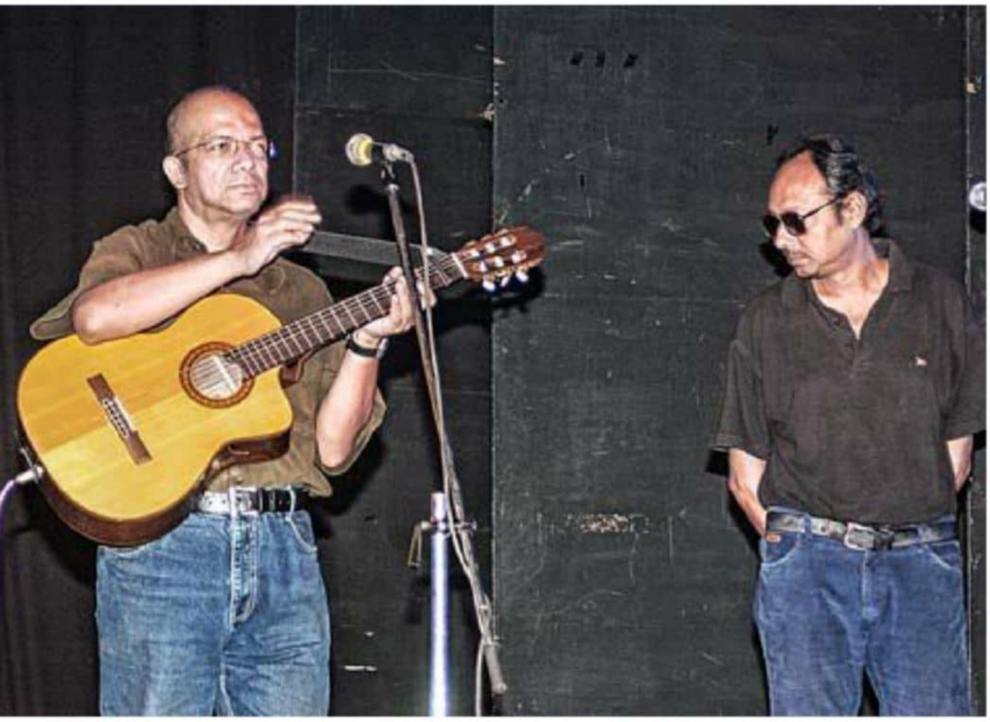
যে ব্লু প্রিন্ট নতুনদের দিয়েছেন, সেই পথেই এগোনো হবে। কথাটা একেবারেই ফাঁকা কোনও বুলি ছিল না। এই দুই কিংবদন্তি খেলোয়াড়ের অনুপস্থিতিতে দেখা গেল, ভারতীয় দল প্রবল আগ্রাসনকে সঙ্গী করেই ইংল্যান্ডের উপর ঝাঁপিয়েছে। আর তাতে দ্বিতীয় টেস্টে পরিস্থিতি এমন হয় যে, তৃতীয় দিনের শেষবেলায় খেলার শুরুর ৯০ সেকেন্ড পরে, ইংল্যান্ড ব্যাট করতে নামে এবং যাতে দ্বিতীয় ওভার খেলতে না হয়, তাই নানা রকমের ফন্দি আঁটে। শুভমনের সঙ্গে জ্যাক ক্রলির অঙ্গভঙ্গি এবং বাদানুবাদের ভিডিয়ো তো এখন প্রায় ভাইরালই হয়ে গিয়েছে। এই ভারতীয় দল আসলে ভবিষ্যতের জন্য তৈরি। শুভমনের নেতৃত্বে এই দলের থেকে একটা ভরসার জায়গা দেখতে চাইছিল বিসিসিআই। সেই দল যারা একত্রিত হয়ে খেলবে। সেটা ইতিমধ্যে প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে। তাই হয়তো শুভমন খুব তাড়াতাড়ি একদিনের ক্রিকেটের অধিনায়কত্বও পাবেন। তবে সেটা ভবিষ্যৎ। যেটা বর্তমান, তা হল, এই দলকে নিয়ে বেশ আশাবাদী হওয়া যেতে পারে। দলে সেভাবে দেখতে গেলে, বুমরা, জাদেজা ও রাহুল ছাড়া তেমন অভিজ্ঞ খেলোয়াড় নেই। বুমরা তো আবার সব টেস্ট খেলছেনও না। তা সত্ত্বেও, ভারত গোটা বিশ্বের কাছে একটা বার্তা রেখেছে। যতই অনভিজ্ঞ হোক, খেলার মাঠে শেষ পর্যন্ত লড়াই করার ক্ষমতা এই দলের আছে। ২০২০ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে গাব্বা টেস্টে জিতে যে রেকর্ড গড়েছিল ভারত, তার কাণ্ডারী কিন্তু ছিলেন তরুণরাই। এবার এই তরুণরাই জয়ের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন। ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৭ সালে। অনেকটা সময় বাকি। কিন্তু অস্বীকার করার উপায় নেই, অভিজ্ঞতা এই দলের পারফরম্যান্সকে আরও ধারালো করে তুলবে। শুভমন গিল ইতিমধ্যে ভারতীয় অধিনায়ক হিসেবে সিরিজ়ের তিনটি টেস্টে ৬০৮ রান করেছেন। বলা বাহুল্য, বিরাট কোহলির রেকর্ডও ভেঙে ফেলেছেন। ঋষভ পন্থ উঠে এসেছেন, সর্বকালের সেরা উইকেটকিপার-ব্যাটার হিসেবে। বুমরা নিজের সেরা সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন। কে এল রাহুল তিন ম্যাচে দু'টি সেঞ্চুরি করে নিজের জায়গা পাকা করেছেন ওপেনিংয়েই। আকাশদীপ এবং সিরাজ বুঝিয়ে দিয়েছেন, প্রথমসারির বোলাররা না থাকলেও, তাঁরা দায়িত্ব কাঁধে নিতে প্রস্তুত। শুধু দরকার মিডল এবং লোয়ার মিডল অর্ডারে কিছু খেলোয়াড়ের ছন্দ ফিরে পাওয়া। সেটা যদি হয়, তা হলে এই ইংল্যান্ড সিরিজ়েই ইতিহাস গড়তে পারে ভারতীয় দল। নয়তো পরের সিরিজ়গুলো তো আছেই। এই দল ভরসার আলো জ্বালাচ্ছে দর্শকের মনে।

কোন ব্যান্ড আগে?

শহরের বাংলা ব্যান্ডগুলি একত্রিত হচ্ছে একটি মিলনমেলায়। একসঙ্গে পারফর্ম করবে একটি কনসার্টে। নাম, ব্যান্ড স্টর্ম। ছ'টি ব্যান্ড হল, ফসিলস, ফকিরা, পৃথিবী, ক্যাকটাস, অঞ্জন দত্ত ব্যান্ড এবং হুলিগানইজ়ম। খুব স্বাভাবিকভাবেই এই কনসার্ট নিয়ে উত্তেজনা ছড়িয়েছে ভক্তদের মধ্যে। কারণ এমন বড় রক কনসার্ট শহরে নিয়মিত হয় না। ফলে টিকিট বিক্রিও হচ্ছে দেদার। কিন্তু এর মধ্যেই তাল কাটল খানিক। ব্যান্ডের এই রিইউনিয়নে নাকি দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে স্লট নিয়ে। মানে, কে কার পরে গাইবে, তা নিয়ে। খব স্বাভাবিকভাবেই শেষ ব্যান্ড হিসেবে পারফর্ম করবে ফসিলস। সেটা ঠিকই আছে। ঝামেলা বেঁধেছিল বাকি পাঁচটা জায়গা নিয়ে। এবং তার জেরে একটি ব্যান্ড, মানে 'লক্ষ্মীছাড়া' কনসার্ট থেকে বেরিয়েই গেল। আসলে অনির্বাণ ভট্টাচার্যর 'হুলিগানইজ়ম' ব্যান্ডটি প্রথমে এই লাইনআপে ছিল না। 'লক্ষ্মীছাড়া' চেয়েছিল শেষের দিকে পারফর্ম করতে। বা নির্দিষ্ট কোনও ব্যান্ডের পরে পারফর্ম করতে। কিন্তু আয়োজকরা চাননি বলে খবর। তাতেই ক্ষুব্ধ 'লক্ষ্মীছাড়া' বেরিয়ে যায়। এবং তাতে লাইন আপের অদলবদল হয়। প্রশ্ন হচ্ছে, এখনও, এত বছর পরেও সেই পুরনো ইগো কেন?



'লক্ষ্মীছাড়া' বেরিয়ে গেল বাংলা ব্যান্ডের সমাবেশ থেকে



কবীর সুমন ও অঞ্জন দত্ত

একসঙ্গে তাঁরা

প্রায় ১৫ বছর পরে ফের একসঙ্গে স্টেজে গান গাইবেন তাঁরা। অঞ্জন দত্ত এবং কবীর সুমন জোট বাঁধছেন একটি কনসার্টকে ঘিরে। সত্যি বলতে কী, এই দুই শিল্পীর বন্ধুত্ব নিয়ে বহু সময় বহু কথা রটেছে। এক কালে 'অনেকদিন পর' বলে একটা অ্যালবাম তৈরি করেছিলেন তাঁরা। কিন্তু তারপর 'রঞ্জনা আমি আর আসব না'র সুর নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়। অঞ্জন এবং সুমন একে অপরের প্রতি প্রবল শ্রদ্ধাশীল হলেও, তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক কেমন, তা নিয়ে কিছু ধোঁয়াশা থেকেই গিয়েছে। সেখান থেকে এত বছর পর এই শিল্পীর একসঙ্গে আসা তাৎপর্যপূর্ণ তো বটেই। সাড়ে তিন ঘণ্টার অনুষ্ঠান হবে এটি। এবং মনে করা হচ্ছে, বহু অজানা গল্প উঠে আসবে এই অনুষ্ঠানে। সঙ্গে নস্ট্যালজিয়ায় সিক্ত গান তো থাকবেই।



■ সেলেনা গোমেজ়। (নীচে) টেলর সুইফ্টের সঙ্গে জন্মদিনে

জন্মদিনে শুভকাজ

সেলেনা গোমেজ়ের ৩৩ তম জন্মদিনের ছবি সোশ্যাল মিডিয়াতে ভাইরাল ইতিমধ্যে। সেখানে বয়ফ্রেন্ড বিয়াঙ্কোকে তিনি চুম্বন করছেন, বান্ধবী টেলর সুইফ্টের সঙ্গে পার্টি করছেন... এমন মুহূর্ত তো ভাল লাগার মতোই। কিন্তু তার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজটি জন্মদিনেই করেছেন এই গায়িকা-অভিনেত্রী। পাঁচ বছর আগে রেয়ার ইমপ্যাক্ট ফান্ড তৈরি করেছেন, মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে লড়াই করা তরুণদের সাহায্যার্থে। এবছরের জন্মদিনে তিনি রেয়ার ইমপ্যাক্ট গিভিং সার্কল শুরু করেছেন। যেখানে দু'মিলিয়ন তরুণ, যাঁরা তাঁর ট্রাস্ট দ্বারা উপকৃত হয়েছেন, একত্রিত হয়ে সাহায্য করবেন অন্যান্যদের। জন্মদিনে উদ্‌যাপন তো হয়ই, তবে এমন শুভকাজ করে মন জয় করে নিলেন সেলেনা।।

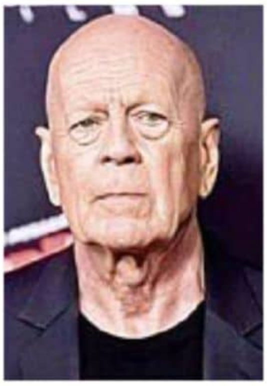




■ এমা ওয়াটসন

লঘুপাপে গুরুদণ্ড

অক্সফোর্ডের রাস্তায় ৩৮ মাইল প্রতি ঘণ্টা গতিতে গাড়ি চালাচ্ছিলেন এমা ওয়াটসন। কিন্তু স্পিড লিমিট ছিল ৩০ মাইল প্রতি ঘণ্টা। ফলে নিজের প্রিয় নীল আউডি আপাতত ছ'মাস চালাতে পারবেন না তিনি! ওভারস্পিডিংয়ের কেসে তাঁর লাইসেন্স ছ'মাসের জন্য বাজেয়াপ্ত করেছে ওয়াইকোম্ব ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট। তার আগে কোর্টের শুনানিতে উপস্থিত ছিলেন না এমা। তাঁর আইনজীবী মারফত ১০৪৪ পাউন্ড (ভারতীয় মুদ্রায় ১,২২,১৫৯ টাকা) ক্ষতিপূরণও দিয়েছেন তিনি। ভেবেছিলেন তাতেই হয়তো খালাস পেয়ে যাবেন। তবে এখন ছ'মাস গাড়ি চালানো থেকে বিরত থাকতে হবে তাঁকে।



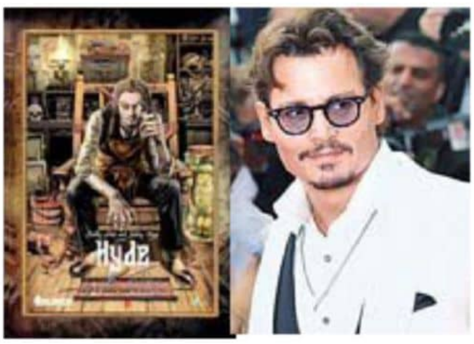
■ ব্রুস উইলিস

স্মৃতিটুকু থাকল না

ডিমেনশিয়ায় আক্রান্ত ব্রুস উইলিস। তিন বছর আগেই অভিনয়ের পেশা থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু এখন ব্রুসের ফ্রন্টোটেম্পোরাল ডিমেনশিয়ার মাত্রা এতই বেড়ে গিয়েছে যে, কথা বলাও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তিনি চলৎশক্তিরহিত। সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হল, নিজের সুদীর্ঘ হলিউডের কেরিয়ার, স্টারডম, অভিনয়জীবন কিছুই আর তাঁর স্মৃতিতে নেই! এতদিন পরিবার, সন্তানদের চিনতে পারছিলেন। এখন তা-ও পারছেন না। মেয়ে টালুলা বাবার খেয়াল রাখছেন, প্রায়ই তাঁর কাছে এসে থাকছেন প্রাক্তন স্ত্রী ডেমি মুর। কিন্তু ব্রুস কাউকে চিনতে পারলে তো!

জনির নতুন অবতার

রিডলি স্কটের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন জনি ডেপ। না, কোনও ছবির জন্য নয়। 'হাইড' নামে (ডক্টর জেকিল ও ডক্টর হাইড অবলম্বনে) একটি গ্রাফিক নভেল সিরিজ় প্রযোজনার কাজে। তাঁরা যৌথভাবে যে গ্রাফিক নভেল সিরিজ়টি নিয়ে এসেছেন, তাতে 'হাইড' দেখতে হুবহু জনি ডেপের মতো। ফলে আশা করা যাচ্ছে, রিডলি স্কটের পরিচালিত সিনেমাও এই গ্রাফিক নভেল অবলম্বনে। সান দিয়েগোর কমিক-কনে মুক্তি পেতে চলেছে এই সিরিজ়টি। জনি যখন নেগেটিভ চরিত্রে এসেছেন, চমৎকার করেছেন। দর্শক অপেক্ষায় 'হাইড' রূপে জনির চমৎকার দেখার।



■ জনি ডেপ। 'হাইড' গ্রাফিক নভেলের এক ঝলক



অ্যানা ডি আরমাস। ইনসেটে টম ক্রুজ়

প্রেমের জোয়ারে

এতদিন তো তাঁদের ব্যক্তিগত প্রচারসচিবরা বলছিলেন, একসঙ্গে ছবি করছেন বলে একসঙ্গে দেখা যাচ্ছে টম ক্রুজ় ও অ্যানা ডি আরমাসকে। কিন্তু এবার যা হল, তাতে তো রাখঢাক থাকছে না। স্পেনের উপকূলে একটি বিলাসবহুল ইয়টে দু’জনেরং নিভৃতি সময় কাটানোর মুহূর্ত উঠে এল পাপারাৎজ়ির ভিডিয়ো ক্যামেরায়। সাদা ড্রেসে অ্যানা এবং সি-ব্লু শার্টে টম একান্তে বসে গল্প করছেন, মাঝেমধ্যে ছুঁয়ে যাচ্ছেন হাত, মন খুলে হাসছেন... এমন সব মুহূর্ত হল ভাইরাল। শোনা যাচ্ছে, অ্যানাকে নাকি প্রচুর উপহারে ভরিয়ে দিচ্ছেন টম। যখন-তখন প্রাইভেট জেটে নিয়ে যাচ্ছেন ছুটি কাটাতে! অ্যানার ৩৭ তম জন্মদিনে অতিথি হিসেবে আসেন টম। আর সেখান থেকেই নাকি সম্পর্কের সূত্রপাত।



■ সামান্থা রুথ প্রভু

একই অঙ্গে বহুরূপ

একই অঙ্গে একাধিক রূপের কথা যদি উল্লেখ করতে হয়, তাহলে নাম নিতে হয় সামান্থা রুথ প্রভুর। ব্যক্তিগত হোক বা পেশাগত, সামান্থার জীবনে চমকের শেষ নেই। 'দ্য ফ্যামিলি ম্যান' এবং 'সিটাডেল: হানি বানি'র পর আবারও রাজ এবং ডিকের তত্ত্বাবধানে কাজ করতে চলেছেন তিনি। বর্তমানে সেই থ্রিলার সিরিজ়টিরই কাজ চলছে। এরই মধ্যে আরও এক বড় খবর। তিনি তো আর এখন শুধুই অভিনয় করেন না, এর পাশাপাশি সামান্থা প্রযোজকও। আর এবার নিজের প্রযোজিত সিনেমাতেই মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করতে চলেছেন অভিনেত্রী। প্রায় দু'বছর পর আবারও একটি তেলুগু সিনেমার মূল চরিত্রে দেখা যাবে তাঁকে এবং ওই সিনেমাটি প্রযোজনাও করবেন সামান্থা।

সিরিজ়ে বাণী

'আবির গুলাল' নিয়ে বিতর্কে মাঝেই ওটিটির পর্দায় পা রাখলেন বাণী কপূর। বাণীকে দেখা যাচ্ছে 'মণ্ডলা মার্ডার্স' সিরিজ়ে। যেখানে বাণীর অভিনয় যথেষ্ঠ প্রশংসিত। 'মর্দানি'র গোপী পুথরান পরিচালিত এই সিরিজ়ে বাণী অভিনয় করেছেন একজন দক্ষ তদন্তকারী পুলিশ অফিসারের চরিত্রে। 'মর্দানী' দেখেই নাকি এমন চরিত্রের জন্য অনুপ্রেরণা পেয়েছেন তিনি। 'রেড টু'র সাফল্যের মাঝেই নতুন মাধ্যমে পা রাখলেন তিনি।



■ বাণী কপূর

জাপান চিকেন: নয়নতারা

দক্ষিণী ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে তিনি ‘লেডি সুপারস্টার’ বলেই পরিচিত। এ ব্যাপারে আবার ঘোর আপত্তি **নয়নতারা**র! মা হওয়ার পর আরও বেশি স্বাস্থ্য সচেতন হয়ে উঠেছেন তিনি। তাঁর পছন্দের রেসিপি একেবারে ইউনিক। নাম ‘জাপান চিকেন’।



টাব্যাস্কো সস



কাজু গুঁড়ো



মাখন



চিকেন ব্রেস্ট

‘জওয়ান’-এ তাঁর যৌবন নজর এড়ায়নি কারওর। মা হওয়ার পর তাঁর সৌন্দর্য বেড়েছে আরও। তবে ডায়েট মানেই জোর করে অপছন্দের খাবার খাওয়া, তা তিনি মনে করেন না। নয়নতারার পছন্দের ভারতীয় খাবার ‘জাপান চিকেন’। নামে ‘জাপান’ শব্দটি থাকলেও, এই পদটি জাপানের নয়। চাইলেই বাড়িতে বানিয়ে নেওয়া সম্ভব ‘জাপান চিকেন’। আর নয়নতারাও বাড়িতেই বানিয়ে উপভোগ করেন তাঁর পছন্দের এই পদটি।



নয়নতারা

উপকরণ: চিকেন ব্রেস্ট ৩০০ গ্রাম, ময়দা ২ চামচ, কর্নফ্লাওয়ার ৩ চামচ, গোলমরিচ গুঁড়ো ২ চামচ, লঙ্কাগুঁড়ো ১/৪ চামচ, তেল পরিমাণ মতো, নুন স্বাদমতো, দুধ ১/২ কাপ, ফ্রেশ ক্রিম ৪ চামচ, কাজু গুঁড়ো ২ চামচ, চিনি ১ চামচ, লঙ্কা কুচি ১ চামচ, কসুরি মেথি ১ চামচ, ধনেপাতা অল্প পরিমাণে, মাখন ১ চামচ, রসুন কুচি ২ চামচ

প্রণালী: প্রথমে চিকেনের টুকরোগুলি ছোট ছোট করে কেটে ভাল করে ধুয়ে নিতে হবে। এরপর একটি পাত্রে চিকেনের টুকরোর সঙ্গে লঙ্কাগুঁড়ো, গোলমরিচ গুঁড়ো, সাদা তেল, কর্নফ্লাওয়ার, ময়দা, নুন ও সামান্য জল দিয়ে ভাল করে মেখে, ২০ মিনিট ঢাকা দিয়ে রাখতে হবে। কড়াইতে তেল গরম করে ২০ মিনিট পর চিকেনের টুকরোগুলি ডুবন্ত তেলে লাল করে ভেজে নিতে হবে। অপরদিকে কড়াইতে প্রথমে ১ চামচ মাখন দিয়ে তাতে একে একে কুচিয়ে রাখা লঙ্কা ও রসুন দিয়ে কয়েক সেকেন্ড নাড়াচাড়া করে দিয়ে দিতে হবে দুধ, কাজু পাউডার, স্বাদমতো নুন এবং চিনি, গোলমরিচগুঁড়ো, কসুরি মেথি। এরপর সব উপকরণগুলো বেশ কিছুক্ষণ ফুটিয়ে তাতে যোগ করতে হবে চিকেনের টুকরোগুলি। আবারও বেশ কিছুক্ষণ ফুটিয়ে গ্রেভিটা খানিক ঘন করে নিতে হবে। সবশেষে উপর থেকে ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে দিলেই প্রস্তুত নয়নতারার প্রিয় পদ ‘জাপান চিকেন’। সঙ্গে নিতে পারেন রুটি কিংবা ভাত।



■ সুস্মিতা এবং সৃজিত (নীচে)

ইন্ডাস্ট্রিতে নতুন কাপল?

সৃজিত মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'লহ গৌরাঙ্গের নাম রে'-র কাস্টে তিনি আগে ছিলেন না। লাস্ট মিনিট এন্ট্রি হয় তাঁর। কিন্তু টিমের শেষ সদস্য হিসেবে ঢুকেও ক্যাপ্টেন অফ দ্য শিপ-এর 'কাছের মানুষ' হয়ে গিয়েছেন। ক্যাপ্টেন অফ দ্য শিপ অর্থাৎ পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায় এবং লাস্ট মিনিট এন্ট্রি অর্থাৎ সুস্মিতা চট্টোপাধ্যায়। ছবির প্রিমিয়ার থেকে সাকসেস পার্টি, সব অনুষ্ঠানে এখন একসঙ্গে দেখা যাচ্ছে সৃজিত ও সুস্মিতাকে। লেট নাইট ডিনার থেকে শুরু করে নাগেরবাজারের কাছে অবস্থিত শপিং মলের মাল্টিপ্লেক্সে নাইট শোয়ে বাংলা ছবি দেখতে যাওয়া, এই জুটির মাখোমাখো প্রেম যেন জমে ক্ষীর! যদিও দু'জনেই কেউ-ই এই বিষয়ে মুখ খুলতে নারাজ।



সাহসী অবতারে

এবার পুজোয় ফের পুলিশ অফিসার 'সংযুক্তা' হয়ে ফিরছেন অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী। কিছুদিন আগেই শুটিংয়ের জন্য তাইল্যান্ডে পাড়ি দিয়েছিল পুরো টিম। তাইল্যান্ডের গিয়ে সেখানের নীল জলরাশিতে নিজেকে অন্যভাবে মেলে ধরলেন অভিনেত্রী। সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে এখন শুধুই মিমির বিকিনি শুটের ছবি। বলি তারকাদের মতোই নিজেকে সাহসী অবতারে তুলে ধরেছেন অভিনেত্রী। নীল জলরাশির বুকে নীল বিকিনি পরে লাস্যময়ী রূপে ধরা দিয়েছেন মিমি।



■ তাইল্যান্ডে মিমি



■ আবীর এবং (নীচে)প্রিয়াঙ্কা সরকার

নতুন জুটি

এই প্রথমবার জুটি বাঁধতে চলেছেন আবীর চট্টোপাধ্যায় এবং প্রিয়াঙ্কা সরকার। পরিচালক অভিরূপ ঘোষের নতুন ছবিতে দেখা যাবে এই জুটিকে। প্রসঙ্গত, অভিরূপ পরিচালিত শেষ ছবি 'মৃগয়া' দর্শক এবং বক্স অফিস দুই ক্ষেত্রেই সাফল্য পেয়েছে। আপাতত নতুন ছবির কাজ নাকি শুরু হয়ে গিয়েছে। ছবির গল্পের নিরিখে এক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে বিবৃতি চট্টোপাধ্যায়কেও। ছবির প্রযোজনায় রয়েছেন মুকেশ পাণ্ডে।





গুঞ্জনে সিলমোহর

'খাদান', 'রঘু ডাকাত'-এর পর দেবের ছবিতে তৃতীয়বার অভিনেত্রী ইধিকা পাল। প্রতিবারই নিজের ছবির জন্য নতুন মুখ বেছে নেন তিনি। কিন্তু 'খাদান'-এর পর সেই ধারা আর বজায় রাখেননি সুপারস্টার। 'রঘু ডাকাত'-এও জায়গা পেয়েছেন ইধিকা। এবার পুজোয় মুক্তি পাবে সেই ছবি। পুজোর পর বড়দিনে আসছে অভিজিৎ-অতনু জুটির 'প্রজাপতি টু'। ঠিক হয়েছিল, সেই ছবিতেও থাকবেন ইধিকাই। পরে মুখ্য চরিত্র হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে ধারাবাহিকের পরিচিত মুখ জ্যোতির্ময়ী কুণ্ডুকে। কিন্তু অবশেষে শুরুর গুঞ্জনেই সিলমোহর পড়ল। ফের দেবের ছবিতে দেখা মিলবে ইধিকার। কিন্তু এই ছবিতে ইধিকার পরিসর খুবই স্বল্প। ইতিমধ্যেই লন্ডন থেকে শুটিং সেরে এসেছে টিম 'প্রজাপতি টু'। সেই টিমে দেখা মেলেনি ইধিকার। তিনি শুটিং করবেন কলকাতাতেই।



দেব, ইধিকা (ডানদিকে)



■ লন্ডনে জ্যোতির্ময়ী এবং দেব

গুঞ্জনই সত্য

জ্যোতির্ময়ী কুণ্ডুর লন্ডন সফরের ছবি ইতিমধ্যেই ভাইরাল সমাজ মাধ্যমে। দেবের আগামী ছবির নায়িকা তিনি, এ ব্যাপারে আর কোনও সন্দেহ নেই। শুটিং শুরুর আগে এই নিয়ে কিছু বলতে না চাইলেও, এখন তিনি নিজেই লন্ডন সফরের কথা সকলকে জানাতে চাইছেন। লন্ডনে টিম 'প্রজাপতি টু' পৌঁছনোর কিছুদিন পরই জানা যায়, তিনিও তখন লন্ডনে। একটি ধারাবাহিকে অভিনয় করেই বড় পর্দায় পা রেখেছেন জ্যোতির্ময়ী... তাও আবার সুপারস্টার দেবের ছবিতে। এই পাওনা তাঁর কাছে স্বপ্নপূরণসম। তিনি নাকি বরাবরই দেবের সঙ্গে কাজ করার স্বপ্ন দেখতেন। এ কথা নিজেই স্বীকার করেছেন। তাই অনুরাগীদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন, নিজের প্রথম ছবির শুটিং স্পটের ছবি। সঙ্গে তাঁর স্বপ্নের নায়কের সঙ্গে ছবিও।

নতুন সফর

হিন্দি ধারাবাহিকে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছেন অভিনেত্রী সন্দীপ্তা সেন। তাঁর ওয়েব সিরিজ় 'নষ্টনীড়'-এর রিমেক হতে চলেছে এই ধারাবাবহিক। ধারাবাহিক থেকেই তাঁর কেরিয়ারের শুরু। কিন্তু বেশ কিছু বছর হল অন্য মাধ্যমে কাজ করছেন তিনি। ধারাবাহিকে ফেরার কোনও ইচ্ছে নেই, এ কথাও একাধিকবার বলেছিলেন। যাই হোক, চেনা মাধ্যমে ফিরলেও, হিন্দি ধারাবাহিকে দেখা যাবে তাঁকে। খুব কম সময়ের জন্য সম্প্রচারিত হবে ধারাবাহিকটি। সন্দীপ্তার পাশাপাশি এই ধারাবাহিকে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে অহম শর্মা এবং আদিত্য সিংহকে। আপাতত ১৫০ পর্বের শুটিং হবে চন্ডীগড়ে। পরে চিত্রনাট্যের প্রয়োজনে বাড়ানো যেতে পারে পর্বসংখ্যা। তবে এই ব্যাপারে এখনই কথা বলতে নারাজ অভিনেত্রী।



■ সন্দীপ্তা সেন







রাজনন্দিনী ও প্রতীক অভিনীত দু'টি ধারাবাহিক

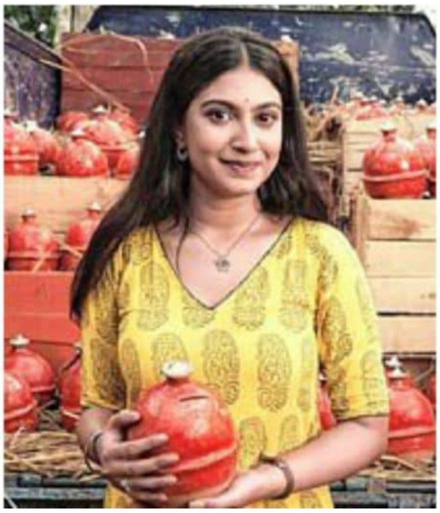
লড়াইয়ে এগিয়ে কে?

দুই চ্যানেলে দু'টি আলাদা ঘরানার নতুন ধারাবাহিক। কিন্তু তাতেও প্রতিযোগিতা ছিল তুঙ্গে। কথা হচ্ছে 'দাদামণি' এবং 'রাজরাজেশ্বরী রাণী ভবানী'র প্রসঙ্গে। একই দিনে প্রকাশ্যে এসেছে এই দু'টি ধারাবাহিকের টিজ়ার এবং প্রোমো। এরপর একই দিন থেকে সম্প্রচারিত হয় ধারাবাহিক দু'টি, কিন্তু আলাদা চ্যানেলে। 'দাদামণি' ধারাবাহিকের মুখ্য চরিত্রে রয়েছেন প্রতীক সেন। দক্ষ অভিনেতা তিনি। তাই আশা ছিল এই গল্প টেক্কা দেবে রাজনন্দিনী পাল অভিনীত প্রথম ধারাবাহিক 'রাজরাজেশ্বরী রাণী ভবানী'কে। কিন্তু আদতে এগিয়ে গেলেন রাজনন্দিনীই। প্রথম সপ্তাহের রিপোর্ট কার্ডেই বাজিমাত। পিরিয়ডিক্যাল ড্রামায় অন্য মাত্রা এনে দিয়েছে রাজনন্দিনী ও অন্যান্যদের অভিনয়। তাই প্রতীকের ধারাবাহিককে পিছনে ফেলে টিআরপি তালিকায় বেশ কিছুটা এগিয়ে গিয়েছে রাজনন্দিনীর প্রথম কাজ।

শুভস্মিতা এবং সৌরভ

আশা জাগায় নতুন জুটি

ফের বাংলা ধারাবাহিকে নতুন জুটি। আসছে নতুন ধারাবাহিক 'লক্ষ্মীঝাঁপি'। যেখানে মুখ্য চরিত্রে দেখা যাবে ছোট পর্দায় জনপ্রিয় মুখ শুভস্মিতা মুখোপাধ্যায়কে। শুভস্মিতার বিপরীতে রয়েছেন সৌরভ চক্রবর্তী। দীর্ঘ আট বছর পর আবার টেলিভিশনের ফিরছেন সৌরভ। ২০১৭ সালে 'মেম বৌ' ধারাবাহিকে শেষবার দেখা গিয়েছিল তাঁকে। এরপর বড় পর্দায় এবং একাধিক ওয়েব সিরিজ়ে কাজ করেছেন তিনি। পরিচালনার কাজেও সৌরভ যে সিদ্ধহস্ত, তা সকলেই জানেন। ধারাবাহিকটি পরিচালনা করছেন সৌমেন হালদার। আগামী ৩০ জুলাই থেকে ছোট পর্দায় দেখা মিলবে এই নতুন জুটির।



শাকিবের বিপরীতে আরাত্রিকা?

সদ্য শেষ হয়েছে ধারাবাহিক 'মিঠিঝোরা'। 'লহ গৌরাঙ্গের নাম রে' ছবির শুটিংও শেষ। তাহলে এখন কী করছেন আরাত্রিকা? সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে গুঞ্জন, এবার বাংলাদেশের মেগাস্টার শাকিব খানের বিপরীতে দেখা যাবে তাঁকে। এ ব্যাপারে জানতে যোগাযোগ করা হয়েছিল অভিনেত্রীর সঙ্গে। আরাত্রিকা অবশ্য বুদ্ধি করেই এড়িয়ে যেতে চাইছেন ব্যাপারটা। তাহলে কি গুঞ্জন বলেই কিছু বলতে নারাজ তিনি? আরাত্রিকার বক্তব্য, "না বললে তো বোঝাবে, আমি কাজ করছি না। কিন্তু সেটা বলব না। তবে কাজ করছি, সেটাও বলছি না। এইটুকু বলতে পারি, ধারাবাহিক ও আমার প্রথম ছবির শুটিং শেষ হওয়ার পর একদিনও বিরতি পাইনি। এটা ঠাকুরের আশীর্বাদ। কিন্তু কী কাজ করছি, সেটা এখনই বলতে পারব না।"



আরাত্রিকা মাইতি, ইনসেটে শাকিব খান



সইয়ারা

7/10

বলিউডের নতুন যুগ

পরিচালনা: মোহিত সুরি
অভিনয়: অহন পাণ্ডে, অনীত পাড্ডা, রাজেশ কুমার, বরুণ বদোলা, আলম খান

এখনও পর্যন্ত বলিউডের এই সময়কালের সব ছবির রেকর্ড ভেঙে ফেলেছে মোহিত সুরির 'সইয়ারা'। প্রেমের ছবি উপহার দিতে সিদ্ধহস্ত তিনি। কিন্তু এই সময়ে দাঁড়িয়ে 'আশিকি টু'র মতো একই উন্মাদনা সৃষ্টি করতে পারে, এরকম ছবি নেই বললেই চলে। 'আশিকি টু'ও তাঁরই সৃষ্টি। 'এক ভিলেন'-এর রসায়নও সেই সময়ের হিট। 'সইয়ারা'র গল্পে নতুন কিছু নেই। বরং ছবির চিত্রনাট্য যে বেশ দুর্বল, তাতে দ্বিমত নেই। ছবিটি দেখতে বসলে পরিচালকের আগের ছবিগুলোর বেশ কিছু দৃশ্য ভেসে উঠবে, তাও নিশ্চিত। কিন্তু তবুও নতুন মুখদের রসায়ন পর্দায় দেখতে বেশ ভাল লাগে। প্রেম, গান, অ্যাকশন, অভিনয়... এই চার স্তম্ভ মিলে ব্লকবাস্টার করে তুলেছে 'সইয়ারা'-কে। ছবিতে কৃষ-এর চরিত্রে অহন পাণ্ডে। যে পেশায় গায়ক, নিজের ব্যান্ডের মূল গায়ক। বাণীর চরিত্রে অনীত পাড্ডা। বাণীও গানের জগতের মানুষ। তাদের প্রেমকাহিনির মেল বন্ধন ঘটে গানের মাধ্যমেই। অনীত ও অহন বলিউডের বর্তমান ও আগামী দিনের তারা। দু'জনেই নিজেদের চরিত্রকে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁদের রসায়ন বলিউডের রোম্যান্টিক ছবিতে ভরসা জোগায়। অ্যাকশন হোক বা রোম্যান্টিক দৃশ্য, পর্দায় অহন সবেতেই মানানসই। তবে অহনের আরও খানিক গ্রুমিংয়ের প্রয়োজন। সংলাপ বলায় আগামী দিনে আরও দক্ষ হবেন অহন, সেই বিশ্বাস রাখা যায়। এ দিক থেকে অবশ্য এগিয়ে অনীত। ছোট ছোট দৃশ্য দেখলেই বোঝা যায় তাঁর নিখুঁত প্রচেষ্টা। কিন্তু বড় তাড়াহুড়োতে শেষ হয়ে যায় সব কিছু। 'সইয়ারা' দেখাতে চায় অনেক কিছুই কিন্তু শেষে দেখায় একটা অংশের সমাপ্তি। মনে থেকে যায় অনেক প্রশ্ন। যে প্রেমের ছবিগুলির সঙ্গে 'সইয়ারা'র তুলনা টানা যায়, তার চেয়ে একেবারে আলাদা এই ছবির শেষ অংশ। দেখতে ভাল লাগে শেষটা। গানের ব্যবহারও এগিয়ে রাখে ছবিটিকে। যদিও গান সহযোগে ক্লাইম্যাক্সে যে সব দৃশ্য যোগ করা হয়েছে ছবিতে, তা অনুমেয়। একবার দেখার জন্য এই ছবি বিনোদনমূলক এবং ভাল। তবে এরকম ছবিই এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে বলিউড ইন্ডাস্ট্রিতে।

ডিয়ার মা

6.5/10

এক মায়ের গল্প

পরিচালনা: অনিরুদ্ধ রায়চৌধুরী
অভিনয়: জয়া আহসান, শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়, চন্দন রায় সান্যাল, ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়, অনুভা ফতেপুরা, অহনা, নন্দিকা দাস

প্রায় ১০ বছর পরে বাংলা সিনেমা পরিচালনায় ফিরলেন অনিরুদ্ধ। আর এই প্রত্যাবর্তন স্মরণীয় হয়ে রইল। কারণ 'ডিয়ার মা' হৃদয়ের এমন কোমল তন্তুতে আঘাত করে, যার রেশ ছবি শেষ হওয়ার পরেও থেকে যায়। 'রক্তের সম্পর্ক নাকি ভালবাসার টান'... ছবির পোস্টারে এই লাইন এবং ট্রেলার দেখে বোঝা যায়, ছবির গল্প কোন দিকে এগোতে পারে। দুই মায়ের মাঝে দত্তক কন্যার দ্বিধার গল্প বলার ক্ষেত্রে বিশেষ কোনও প্যাঁচ-পয়জারের সাহায্য নেননি পরিচালক। শুধু থ্রিলারের ঢংয়ে আখ্যান শুরু করেছেন এবং আস্তে-আস্তে চরিত্রগুলির মনোজগতে ঢুকে, বিচরণ করেছেন। আর তাতে আলাদা করে আবেগের স্থূলত্ব নেই। বরং অত্যন্ত স্মার্ট ভঙ্গি আছে। বৃন্দা (জয়া) এবং অর্ক (চন্দন) কন্যাসন্তান দত্তক নেয় এবং তাদের জীবনে আসে ছোট্ট সোহিনী (অহনা, নন্দিকা)। তার



পর একটু বড় হয়ে সেই কন্যা খুঁজে পায় তার আসল মা'কে। এবং তার টানাপড়েন শেষে কোনদিকে যায়, তাই নিয়ে 'ডিয়ার মা'-এর গল্প। গল্পের লেখক অনিরুদ্ধ ও শাক্যজিৎ খুব আধুনিক মননের সঙ্গে গল্পটি লিখেছেন। তাতে কোনও পূর্বসংস্কার নেই। সংলাপও খুব স্মার্ট। খুব সহজেই দর্শকমনে সঞ্চারিত হয় ছবির গল্প। মনে হতে পারে, জয়া, মানে বৃন্দার যে চরিত্র পরিচালক এঁকেছেন, তা একটু আরোপিত। কিন্তু তলিয়ে ভাবলে দেখা যায়, এই শহরে কর্মরতা নারীর মন এরকমই হয়। অভিনয় জয়া তেমনই ভাল অভিনয় করেছেন। খুব সুন্দর দেখতে লেগেছে তাঁকে। তবে মন ছুঁয়ে গিয়েছেন চন্দন রায় সান্যাল। এত সুন্দর করে পিতার মন পড়ার জন্য পরিচালককে ধন্যবাদ। শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়ও খুব ভাল। তাঁর মধ্যেও যে এক ধরনের মাতৃত্ব আছে, তা চিত্রনাট্যে ধরা পড়েছে। তবে ভীষণ ভাল লাগে অনুভা ফতেপুরা এবং দুই শিশুশিল্পীকে। একেবারে চরিত্রের মধ্যে ঢুকে গিয়েছেন তাঁরা। অহনা ও নন্দিকা তো ভীষণ মিষ্টি, অথচ পরিণত। বিক্রম ঘোষের আবহ সঙ্গীতের ব্যবহার ছবির গতিকে এগিয়ে দিয়েছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু সব গান হিন্দিতে কেন? যেভাবে সোহিনী মা-কে খুঁজে পায়, তা বাস্তব থেকে খানিকটা দূরে। গল্প ও চরিত্র তৈরির ক্ষেত্রে পরিচালক যে সময় প্রথমার্ধে নিয়েছেন, তা কমানো যেত। দ্বিতীয়ার্ধে বরং ছবি অনেক বেশি গতিপ্রাপ্ত হয়। যদিও বলতে বাধা নেই, এই খটকা নিতান্তই সমালোচকের দৃষ্টিতে। আসলে 'ডিয়ার মা' এমন একটি ছবি, যা ভালবাসতে শেখাবে। কর্মব্যস্ত, একাকিত্বের শহরে হৃদয় আর্দ্র করবে। অনিরুদ্ধকে ধন্যবাদ এমন একটি ছবি উপহার দেওয়ার জন্য।

জুরাসিক ওয়র্ল্ড: রিবার্থ

অ্যাকশন দৃশ্য অনবদ্য

পরিচালনা: গরেথ এডওয়ার্ডস
অভিনয়: স্করলেট জোহনসন, জোনাথন বইলে, লুনা ব্লইসে, রূপার্ট ফ্রেন্ড

6.5/10

'জুরাসিক ওয়র্ল্ড: ডোমিনিয়ন' রিলিজ়ের তিন বছর পর মুক্তি পেল পরের পর্ব 'জুরাসিক ওয়র্ল্ড: রিবার্থ। ছবিটি ইতিমধ্যেই অনুরাগী মহলে ছাপ ফেলেছে। গল্প বলার ধরন এগিয়ে রেখেছে এই ছবিকে। গল্পের মূল প্রেক্ষাপট হল আমেরিকার এক ঔষুধ কোম্পানী তিন ডাইনোসরদের ডিএনএ থেকে এক বিরল ওষুধ তৈরি করবে, যা আগামী দিনে নিয়ন্ত্রণে আনবে হৃদরোগের মতো নানা সমস্যা। এই ছবির মূল নায়ক স্করলেট জোহনসন। যাঁর অভিনয় দুর্দান্ত। ছবিতে তাঁর অভিনয়ের জন্যই অন্য মাত্রা পায় চরিত্রটি। একদিকে যেমন তাঁর চরিত্রে রয়েছে মানবিকতার ছোঁয়া, অন্যদিকে অ্যাকশন দৃশ্যেও তিনি অনবদ্য। পার্শ্বচরিত্রে অন্যান্যদের অভিনয়ও বেশ ভাল। বলা বাহুল্য, এই ছবির অ্যাকশন দৃশ্যগুলি অনেক যত্ন নিয়ে বানিয়েছেন পরিচালক। যা এই ছবির মূল এউএসপি। দর্শককে শেষ পর্যন্ত ধরে রাখে অ্যাকশন দৃশ্যগুলিই। তবে যে যে মজার দৃশ্য বা মজার সংলাপের ব্যবহার করা হয়েছে, তাও যথাযথ। তবে ছবির মূল গল্প দেখতে বা জানতে গেলে পুরো ছবি দেখা আবশ্যক।



মালিক

4.5/10

একা রাজকুমার

পরিচালক: পুলকিত
অভিনয়: রাজকুমার রাও, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়

স্টিরিয়টাইপড হয়ে যাওয়া রাজকুমার রাও নতুন করে নিজেকে আবিষ্কার করার জন্যই কি বেছে নিলেন গ্যাংস্টার ড্রামাকে? আসলে তাঁর মতো পাওয়ারফুল অভিনেতাকে বলিউড সেভাবে ব্যবহারই করতে পারেনি! অ্যাকশন চরিত্রেও তিনি যে অসামান্য, তা বুঝতেই পারেনি ইন্ডাস্ট্রি। 'মালিক' তাই অগুণতি গ্যাংস্টার ড্রামায় এক ক্লান্তিকর সংযোজন হলেও, রাজকুমারকে কুর্নিশ তিনি আরও একবার তাঁর জাত চেনালেন। ছবি দেখে মনে হবে, এ বোধহয় 'গ্যাংস অফ ওয়াসিপুর'-এর ভাবনায় নির্মিত। আবার মনে হতে পারে, মনোজ বাজপেয়ীর 'ভইয়াজি'র স্পিরিচুয়াল সাকসেসর। আশির দশকের শেষদিককার এলাহাবাদে গল্প স্থিত। চাষির ছেলে দীপক (রাজকুমার) জমিদারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে গ্যাংলর্ড হয়ে ওঠে। নিজেই নিজেকে 'মালিক' পদবী দেয়। কিন্তু এই মালিক বন্দুক তুলে নেয় জাতিগত বিদ্বেষের বিরুদ্ধে। তবুও তার লক্ষ্য স্পষ্ট হয় না। নিরবচ্ছিন্ন খুন, অ্যাকশন, রাজনৈতিক নেতাদের মদত প্রাপ্ত মালিক...চেনা ট্রোপে গল্প এগোতে থাকে। রাজনীতি নেতার ভূমিকায় স্বনন্দ কিরকিরে ও সৌরভ শুক্লকে মানিয়েছে দিব্যি। কিন্তু এতটাই ক্লিশে প্লট যে তাঁরাও বিশেষ কিছু করতে পারেন না। বরং, চমক দিয়েছেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। বয়স্ক এনকাউন্টার স্পেশ্যালিস্টের ভূমিকায় তিনি মন জয় করেন। তার লক্ষ্য মালিককে শেষ করা। মানুষী ছিল্লর, অংশুমান পুষ্কর, সৌরভ সচদেব সকলেই প্রায় প্রেডিক্টেবল চরিত্রের জালে আটকে। এডিটিং থেকে ছবির গতি, সবেতেই খুঁত ধরা সম্ভব। সচিন জিগরের সুরে একটি আইটেম গান ছাড়া কিছুই মনে থাকে না। তবে এসবের মধ্যেও রাজকুমার রাও সত্যিই অনবদ্য।



সুপারম্যান

5/10

নতুন, কিন্তু একঘেয়ে

পরিচালনা: জেমস গান
অভিনয়: ডেভিড করেনসেট, রেচেল ব্রসনাহন, নিকোলাস হল্ট

ডিসি ইউনিভার্স নতুন করে যাত্রা শুরু করল এই ছবির মাধ্যমে। কারণ সুপারম্যান চরিত্রে এবার নতুন অভিনেতা। ডেভিড করেন্সের পিঠে চড়েছে 'কেপ'। তবে শুধু চরিত্র কেন, দুনিয়া, দৃষ্টিভঙ্গি... সবই তো বদলে দিয়েছেন পরিচালক। এই সুপারম্যান এলিয়েন, যে মানুষের মধ্যে থাকে। কিন্তু সব সময় খুঁজে যায় নিজের আসল পরিচয়। ছবিটির চিত্রনাট্যে কমেডির বহু রসদ ঢুকিয়েছেন পরিচালক। তাতে কমিক্সের পুরনো স্বাদ পাওয়া যেতে পারে। তবে ওইটুকুই। তাছাড়া চিত্রনাট্যে নতুন কিছু নেই। এবার নিজেকে খোঁজার পাশাপাশি সুপারম্যানের লড়াই লেক্স লুথার নামে এক টেক জিনিয়াসের সঙ্গে। যে সুপারম্যানকে ধ্বংস করতে চায় একটাই কারণে। যাতে পৃথিবী পেশিশক্তির চেয়ে বেশি মগজের সামনে মাথানত করে। তবে যেটা বললাম, সুপারম্যানের চরিত্রে একটি নতুন স্তর যোগ করা ছাড়া চিত্রনাট্যে নতুনত্ব কিছুই নেই। শুধু মারকাটারি অ্যাকশন আছে। শুধু সেটুকু দিয়ে হয়তো ক্ষণস্থায়ী সাফল্য পাওয়া যায়, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি রেশ রাখা যায় না। তবে হ্যাঁ, অভিনয় সকলেরই খুব ভাল।





আপ জ্যায়সা কোই

ভালমন্দের মিশ্রণ

5/10

পরিচালক: বিবেক সোনি
অভিনয়ে: আর মাধবন, ফতিমা সানা শেখ

জামশেদপুরের শ্রীরেণু ত্রিপাঠির (আর মাধবন) বয়স ৪২, মোটেও সিঙ্গল থাকতে ইচ্ছুক না হলেও অবিবাহিত। তার জীবন বদলে যায় বছর ৩২-এর মধু বসুর (ফতিমা সানা শেখ) সঙ্গে আলাপের পর। শ্রীরেণু জামশেদপুরের, মধু কলকাতার। দু'জনে সম্পূর্ণ আলাদা ব্যক্তিত্ব, আলাদা পছন্দের ও মানসিকতার মানুষ। দু'জনের প্রেমও হয়। কিন্তু শ্রীরেণু ভাবতে থাকে এত কম বয়সি, সুন্দরী একজন কেন তাকে পছন্দ করল! ছবিতে ওল্ড স্কুল রোম্যান্সের চার্ম পাবেন দর্শক। ধর্মা প্রোডাকশনের 'কুছ কুছ হোতা হ্যায়'-এর ঘরানার মিষ্টি রম-কম উপস্থাপন করতে চেয়েছেন পরিচালক। ধীরে ধীরে সম্পর্কের পরত খুলতে থাকে। ইগোয়িস্টিক পুরুষ হিসেবে শ্রীরেণুকে আবিষ্কার করে মধু। শ্রীর বাড়িতে তার ভাইও অনেকটা সেরকমই। অন্যদিকে মধু বেড়ে উঠেছে প্রগ্রেসিভ বাঙালি পরিবারে। কিন্তু সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব দেখাতে গিয়ে গল্পটি একটু খাপছাড়া লাগে। পর্দায় অসংখ্য চরিত্রের উপস্থিতি আরও বেমানান লাগে। পিতৃতন্ত্রকে ঠিক কী ভাবে উপস্থাপন করা উচিত ছিল, বোধহয় বুঝে উঠতে পারেননি পরিচালক ও লেখক। তবে মাধবন ও ফতিমার রসায়ন খারাপ লাগে না। বয়সের পার্থক্য, সামাজিক দ্বন্দ্ব ইত্যাদির বদলে শুধু রোম্যান্সকে মধ্যমণি করলেই বোধহয় ভাল হত।

স্পেশ্যাল অপস ২

পুরনোতেই মন

5.5/10

পরিচালনা: নীরজ পাণ্ডে
অভিনয়: কে কে মেনন, বিনয় পাঠক, করণ ট্যাকর, গৌতমী কপুর, পরমীত শেঠি

শুরুর সিজ়নেই স্পেশ্যাল অপস যে আশা দেখিয়েছিল, তাতে পরবর্তী সিজ়নের জন্য অপেক্ষা করা বেশ কঠিন হয়ে পড়েছিল। অবশেষে সব অপেক্ষার অবসান ঘটেছে দ্বিতীয় সিজ়নে। কোভিডের আবহে প্রযুক্তিগত যুগকে এক অন্য মাত্রায় তুলে ধরেছিলেন নীরজ পাণ্ডে। দ্বিতীয় পর্বেও তার খামতি নেই। প্রযুক্তি, রাজনীতির মতো বিভিন্ন দিককে যথাযথভাবে মেলে ধরা হয়েছে এই সিরিজ়ে। অ্যাকশনের দৃশ্য নিয়ে আফসোস থাকতেই পারে। কিন্তু চিত্রনাট্যের প্রয়োজনে শুটিংয়ের জন্য যে যে জায়গা বেছে নেওয়া হয়েছে, তা প্রশংসনীয়। কে কে মেনন এই ছবির সম্পদ। বাকিরাও যথাযথ। গল্পে ক্লাইম্যাক্স এমনভাবে রয়েছে, যাতে এতটুকু মেকি বা অতিরঞ্জিত লাগে না সিরিজ়টি। তবে শব্দের প্রয়োগে আরও সচেতন হওয়ার প্রয়োজন ছিল। সবশেষে বলা আবশ্যক, হলিউডের ধাঁচের বলিউডি এই সিরিজ় এগিয়ে থাকে অনেক ভাল সিরিজ়ের থেকে।



শামুক এবং অন্যান্য

টেস্ট গসিপ নিয়ে আনন্দলোকে হাজির সোশ্যালাইট **মিস আঙুরলতা**

ক’দিন কী বৃষ্টিই না হল। শহর তিলোত্তমা ভেনিস হয়ে যায় যায়! তাতে আপাতদৃষ্টিতে চলাফেরার সমস্যা মনে হলেও, কপোত-কপোতির তো পোয়াবারো! গন্ডোলা চেপে নিভৃতে প্রেম করতে পারবে। তাই তো এই সুযোগ নেওয়ার জন্য একেবারে আকুলিবিকুলি করছিল সৃষ্টিঠাকুর ও সদাহাস্যময়ী। শহর থেকে আরও অনেক দূরে যাওয়ার এই তো পরিবেশ-পরিস্থিতি। তাই যখন প্রথমার্ধের প্রবল বৃষ্টিতে শহর থরথর, তারা তখন ধৈর্য ধরে বসেছিল। রাস্তাঘাট কখন শুনশান হয়, সেই চিন্তায়। যেই হল, অমনই তারা চলে গেল শহরের উপকণ্ঠে। এক ‘নাম কা ওয়াস্তে’ টাইপের মাল্টিপ্লেক্সে। যাতে নিভৃতে-নীরবে প্রেমের আগমন ঘটানো যায়। হতেই পারে, মধুমাসে এই প্রেমের আগমন একবারই হবে। কিন্তু সুযোগ চাই তো! অবশ্য এই মাল্টিপ্লেক্সে সারাবছরই নীরবতা বিরাজ করে। সিনেমা তারা কতটা দেখল জানা নেই, কিন্তু একদম পিছনের রিকলাইনার সিটে বসেছিল একত্রে, মুখ ঢেকে। যাতে কলঙ্কের দাগ ছুঁতে না পারে। অবশ্য সৃষ্টিকে এখন দোষ দেওয়া যায় না। সে তো এখন সিঙ্গল। একা চিত্ত পূর্ণ করতে তো কসরত করতে হবেই। কিন্তু সৃষ্টিকে বলি, একটু সাবাধানে থাকিস বাপু। এই বন্ধু কিন্তু এখনও হাসি হাসি মুখ নিয়েই তোর চরিত্রের আদ্যোশ্রাদ্ধ করে চলেছে। দেখিস, পচা শামুকে পা না কাটে।

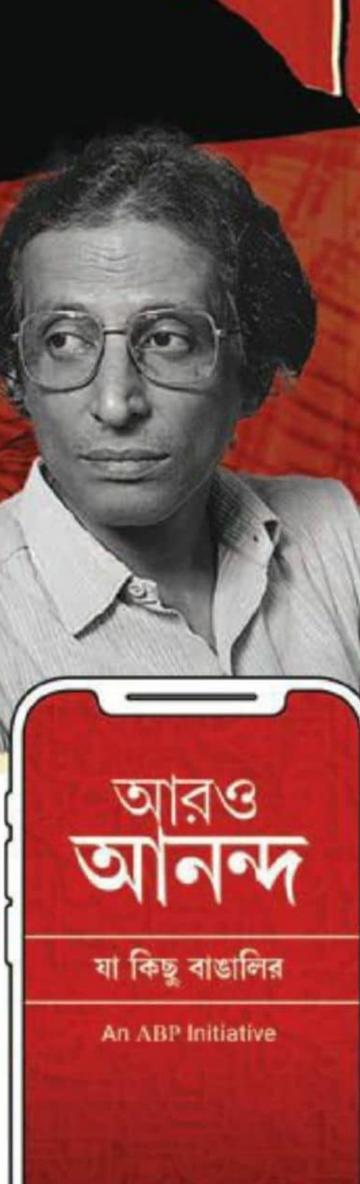
অবশ্য শামুকের ভয় এই তারাজগতের লোকেদের নেই। তাই তো চাঁদরাজা এই বৃষ্টির সুযোগ নিয়েই এক বঙ্গতনয়ার সঙ্গে কফি খেতে গিয়েছিল কিছুদিন আগে। হাতে হাত রেখে তাদের সে কী গল্প! কে বলবে, কিছুদিন আগে বৌকে নিয়ে তার আদিখ্যেতার ভিডিয়ো এই তনয়াটিও দেখেছে।

অবশ্য এতে যদি ভাবেন, চাঁদরাজার খুব লজ্জা হবে... তা হলে বলি, মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন। কারণ এই ইন্ডাস্ট্রিতে থাকতে গেলে, লজ্জা, ঘেন্না, ভয়ের জলাঞ্জলি দিতে হয়। এই তো সেদিন, ছোট বিদেশি অভিনেতার জন্মদিনের পোশাক পরিহিত অবস্থায় একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হল। সেখানে সে আত্মরতির ধাঁধায় উদ্ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিল। লোকে ভাবল, ছোট বিদেশি বুঝি লজ্জাতেই গর্তে সেঁধিয়ে যাবে। কিন্তু কোথায় কী! তার ফ্যানদের তরফ থেকে বলা হল, এটি নাকি একটি সিনেমার ক্লিপ। কেউ দুষ্টুমি করে ভাইরাল করে দিয়েছে। আবার পরক্ষণেই ছোট বিদেশি নিজের মুখে স্বীকার করল, সে প্রশাসনের সাহায্য নেবে। তা হলে কোনটা ঠিক? সিনেমার দুষ্টু ক্লিপ ভাইরাল হয়ে যাওয়া এক জিনিস। আর প্রশাসনের সাহায্য নেওয়া তো সম্পূর্ণ অন্য! আসলে ছোট বিদেশি এখন এই ধাঁধা থেকে বেরোতে পারেনি। কোন কথা যে বলবে, আর কোনটা লুকোবে, তা ভেবেই জেরবার। আসলে দেহমনে এত প্রেম থাকলে তো পচা শামুকে পা কাটবেই।





বত্রিশ পাটি দাঁত
গল্প রচনায়
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
গল্পপাঠে
অম্বরীশ ভট্টাচার্য



আরও আনন্দ
যা কিছু বাঙালির
An ABP Initiative


চলচ্চিত্র ও সাহিত্যের রঙিন পূজাবার্ষিকী
আনন্দলোক
১৪৩২
এবার পুজোর গসিপে
তোমার রোম্যান্স!
sosideas
উপন্যাস | ফ্যাশন | হলি-বলি-টলি ফোটোফিচার | ওয়েব দুনিয়া | মিউজ়িক | সেলেবদের সাক্ষাৎকার